# Working Paper

SPECIAL SERIES: CHANGING VILLAGE

NO. 72 ● JUNE 2025

# অভিবাসন ও পরিবর্তনশীল গ্রাম

আফসান চৌধুরী

BRAC Institute of Governance and Development (BIGD)
BRAC University

# অভিবাসন ও পরিবর্তনশীল গ্রাম

আফসান চৌধুরী

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থস্বত্ব © BIGD

প্রকাশকাল: জুন ২০২৫

প্রকাশক: BIGD, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদক: নুসরাত জাহান ও মাধুরী গোস্বামী

প্রচ্ছদ ও পরিকল্পনা: মো: আব্দুর রাজ্জাক

ISBN | 978-984-95752-4-5

# গ্রাম ও পরিবর্তন: অভিবাসন

এই ওয়ার্কিং পেপারের উদ্দেশ্য গ্রামজীবন ও সমাজের পরিবর্তন শনাক্ত করা, ভালো-মন্দ বিচার করা নয়। তবে এখানে ইতিবাচক ও নেতিবাচক—উভয় ধারা নিয়েই আলাপ করার চেষ্টা হয়েছে। মাঠপর্যায়ে গবেষকগণ পূর্বের ও বর্তমান অবস্থা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে পরিবর্তনগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করার জন্য। নিচে অভিবাসনের ক্ষেত্রে মূল কয়েকটি পরিবর্তন উলেখ করা হলো।

গ্রামের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অভিবাসন একটি গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। এই গবেষণা অনুযায়ী সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, অভিবাসনের ফলে দারিদ্র্য কমেছে, নতুন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণি তৈরি হয়েছে, এবং টাকা পয়সার লেনদেন বেড়েছে।

আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অভিবাসন উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। আন্তর্জাতিক অভিবাসনে অধিক অর্থে প্রয়োজন। পূর্বে জমি বিক্রি বা বন্ধক দেয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না। কিন্তু আর্থিক পরিসর বৃহৎ হবার ফলে বিভিন্ন ধরনের ঋণ কার্যক্রম চালু হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একাধিক এনজিও ইদানিং এতে জড়িত, ব্যাংকের সুবিধাও পাওয়া যায় কিছুক্ষেত্রে। সাথে সাথে পরিবার বা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্কভিত্তিক ঋণ আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। এছাড়া এখন সাধারণভাবে পরিচিতজনের কাছ থেকেও সুদে টাকা ধার পাওয়া সম্ভব, যেহেতু অভিবাসনে লগ্নি অনেকটাই নিশ্চিত মুনাফা এনে দেয়।

যোগাযোগের সামাজিক সম্পর্কে জাল অনেক বিস্তৃত হওয়ার ফলে ব্যর্থ অভিবাসন আপাতঃদৃষ্টিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। স্থায়ী ব্যর্থ অভিবাসন কমেছে বলা যায় কারণ একবার ব্যর্থ হলেও মানুষ আবার চেষ্টা করে, করা সম্ভব। বিদেশে সেটা মধ্য প্রাচ্য হোক, ইউরোপ হোক বা ভারত, যোগাযোগের সূত্রের কারণে বেশিরভাগ অভিবাসী কোনো না কোনো কাজ পেয়ে যায়। কপর্দকহীন ফেরত আসার উদাহরণ আগের তুলনায় অনেক কম। তবে মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে এটি এখনও চলমান, যেখান থেকে অধিকহারে পর্যুদস্ত অবস্থায় ফেরত আসার উলেখ পাওয়া যায়।

অভিবাসনের গন্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক যা একইসাথে একাধিক বাস্তবতা ধারণ করে। মানুষ সবচেয়ে বেশি যায় মধ্যপ্রাচ্যে। সেই অর্থে মধ্যপ্রাচ্যকে অভিবাসনের মূলকেন্দ্র বলা যায়। তবে সেখানে অভিবাসিত হয়ে যেসব পেশায় মানুষ যুক্ত হয় সেগুলি কম রুজির কায়িকশ্রমের কাজ। অন্যদিকে ইতালির অভিবাসন অর্থনৈতিকভাবে অনেকবেশি লাভজনক, এবং অভিবাসীদের সেখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ারও সুযোগ আছে। তবে ইতালিতে যেতে হলে কিছুটা শিক্ষিত হতে হয়, অর্থাৎ গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণির পক্ষেই তা চেষ্টা করা সম্ভব। অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গমন কম লাভজনক কারণ কাগজ পত্র, দালালের বাটপারি ও কাজের সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক অভিবাসীর প্রচুর ভোগান্তি হয়। ভারতে বেশকিছু অভিবাসন হয় সামাজিক কারণে, যেগুলোর সবই অনিয়মিত অভিবাসন।

যেহেতু পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বাংলাদেশি প্রবাসে খুঁটি গাড়তে পেরেছে, তাই কাজ পাওয়া আগের চেয়ে কম কষ্টের। অনেক অভিবাসী একসাথে একাধিক কাজ করে যাতে সঞ্চয় ভালো হয়। বেশিরভাগ টাকা সে দেশে পাঠায় যা পরিবারের অবস্থা মৌলিকভাবে পাল্টে দিচ্ছে। যেহেতু বাংলাদেশের প্রবাসীগোষ্ঠীর সংখ্যা ২ কোটির আশেপাশে, সেহেতু গোটা গ্রাম-দুনিয়ায় এর প্রভাব পড়েছে।

তবে আগের মতই অভিবাসীর অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ কম, কীভাবে সঞ্চয় পুঁজিতে পরিণত করতে হবে সেক্ষেত্রেও তাদের জ্ঞান সীমিত। এর ফলে যেমন প্রতারকের হাতে টাকা যায়, তেমনি যায় নতুন বাড়ি, ঘর, বিয়ে ও জমকালো পরিসরের খরচে। জমিতে লগ্নি করার ফলে কৃষিজমির দাম বাড়ছে। সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সুদের ব্যবসা। দোকানে এবং বাজারে বিনিয়োগ হচ্ছে। কিন্তু কোনো বিনিয়োগ কাঠামো গড়ে ওঠেনি। যেহেতু অভিবাসীরা খরচে আগ্রহী, তাই কিছু নতুন সুযোগ হয়েছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই সব সুযোগ চাহিদা ও দরকারের তুলনায় কম, অনেকটা আগের মতই।

পারিবারিক পর্যায়ে একাধিক পরিবর্তন ঘটছে। অভিবাসীর কারণে পরিবারের সদস্যদের ধুমধাম করে বিয়ে হচ্ছে, বাড়ি সংস্কার ও জমকালো করা হচ্ছে, ঋণের বোঝা কমছে। একইসাথে যৌথ পরিবারও কমছে, যেহেতু একসাথে বসবাসের তাগিদ এখন কম। বিদেশ থেকে যার কাছে টাকা আসে সে প্রভাবশালী হচ্ছে, অনেকক্ষেত্রে যেটা বাড়ির পুত্রবধূ। এর ফলে পরিবারে বাবা-মার-মুরুব্বিদের যে একক কর্তৃত্ব এক সময় ছিল সেটি কমছে।

পারিবারিক পরিসরে অনেক নেতিবাচক পরিবর্তনও হচ্ছে। যেমন বাবা-মা বৃদ্ধ হলে আগের চেয়ে সেবা কম পাচ্ছে, পরিবারে তাদের প্রভাব আগের থেকে দুর্বল হচ্ছে, বাচ্চারা বড় হচ্ছে বাবা ছাড়া, এবং বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক বাড়ছে। অর্থাৎ পারিবারিক জীবন আগের চেয়ে জটিল বলা যায়। তবে এর কারণে কেউ অভিবাসনের বিরোধিতা করেছে তেমন তথ্য পাওয়া যায়নি।

একাধিক ব্যক্তির অবস্থাপন্ন হবার ফলে পুরাতন যে ক্ষমতা কাঠামো ছিল তার ওপরও প্রভাব পড়েছে। বিভিন্ন দল, গোষ্ঠী, অভিবাসীদের কাছ থেকে চাঁদা চাইছে এবং পাচ্ছে, যার ফলে অভিবাসীদের প্রভাবের একটি নতুন পরিসর তৈরি হচ্ছে। তবে পুরাতন জমিভিত্তিক ক্ষমতাকাঠামোর অংশ যারা ছিল, বিভিন্ন সূত্র থেকে অর্থপ্রাপ্তির ফলে তাদের অবস্থান এখনো অনেকাংশেই অপরিবর্তিত আছে। তবে লক্ষণীয় যে, অভিবাসীরা কেবল নিজেরা কোন নতুন গোষ্ঠী তৈরি না করে পুরাতন ক্ষমতাশীল গোষ্ঠিসমূহের সাথে যুক্ত হতে বেশি আগ্রহী।

শুধু অভিবাসনের জন্য নয়, নানা কারণে পুরাতন প্রতিষ্ঠান ও ক্ষমতার জাল নয়াচিত্র ধারণ করছে। গ্রামে ক্ষমতা ভাগাভাগির দ্বন্দ্ব, অধিক রসদ ও অর্থ, এবং জাতীয় রাজনীতির প্রভাব বেশি আগের তুলনায়। তাই পরিবর্তন দেখা যায় সকলক্ষেত্রে। বিদেশে যেতে যেহেতু ইউনিয়ন পরিষদ সদস্যের সই লাগে তাই এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতাও বেড়েছে। দীর্ঘদিনের সামাজিক ক্ষমতা প্রয়োগেকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কিছুটা দুর্বল হলেও এখনও টিকে আছে। একইসাথে, নয়া প্রতিষ্ঠানসমূহ আগের চেয়ে সবল কিন্তু কেউ একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসন আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মত লাভজনক নয়, তবে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের জন্য একটি বড় ভরসাস্থল। এবং এর ফলেও গ্রামীণ দারিদ্র্য কমেছে। পূর্বে এটি পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এখন এতে যুক্ত হয়েছে নারী, বিশেষ করে গার্মেন্টস শিল্পের শ্রমিক হিসাবে। ফলে গোটা গ্রামে ও জীবনে একটি বড় প্রভাব পড়েছে। তবে এর একটি শ্রেণিচরিত্র রয়েছে, অর্থাৎ এই অভিবাসন প্রধানত মাঝারি ও অতিদারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল। তথ্য থেকে জানা যায় যার যে, অনেক পুরাতন কায়িক শ্রমনির্ভর পেশা পাল্টে গেছে যেমন, মাটি কাটার কাজ। তার চেয়ে অনেকে ইটভাটা, নির্মাণশিল্প এ ধরনের কাজে যুক্ত হচ্ছে। তবে লক্ষণীয় যে, যেহেতু এই সব কর্মে অর্থপ্রাপ্তি হয়, তাই অনেকে গ্রামপর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে মূলত গ্রামেই থাকে, এবং কিছু মাস কাজে যায় গ্রামের বাইরে।

নারীশ্রমিক একটি নয়া বাস্তবতা অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে এবং তারা কেবল ঢাকায় নয় অন্য স্থানেও যাচ্ছে। এছাড়া তারা গৃহকর্মীর কাজ করতেও নানা স্থানে যায়। এদের ক্ষেত্রেও দালালদের দেখা পাওয়া যায় আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মত।

সামগ্রিকভাবে দেখতে গেলে নারী আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অভিবাসন, দুইক্ষেত্রেই ইতিবাচক অবস্থানে আছে। বিদেশী অভিবাসনের ক্ষেত্রে পাঠানো টাকার অনেকক্ষেত্রে তাদের নামে আসে এবং এতে পরিবারের ক্ষমতার ভারসাম্য তার পক্ষে যায়। তার অবস্থান পরিবারে অধিক সবল বলা যায়। তবে সামাজিক অসুবিধার ঘটনাও ঘটে। বিশেষ করে পারিবারিক শত্রুতা, বিবাহবিচ্ছেদ ইত্যাদি। নারীর অভিবাসন এখনো ঝুঁকিপূর্ণ, তার কাজের সাথে আসে নানা ধরনের সংকট, এমনকি যৌন নির্যাতনও; সবল নারীর ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটে। তবে এর ফলে তার সুযোগ গ্রহণ ও অবস্থানের ওপর প্রভাব পড়ার তথ্য আসেনি।

শহরে বসবাসরত নারীকর্মীরা গ্রামীণ পরিসরের চেয়ে তুলনামূলকভাবে অধিক স্বাধীনতা উপভোগ করে। যদিও দুই জায়গায়ই নারীর যৌন হয়রানির সম্ভাবনা বা অন্যান্য জীবনসংকট আছে, তবে শহরে থাকা নারীদের তা সামলাবার ক্ষমতা কিছুটা বেশি। গ্রামের মানুষ বেশকিছু ক্ষেত্রে অভিবাসী নারীদের জীবনযাত্রার সমালোচনা করলেও কেউ নারী অভিবাসনের বিপক্ষে নেই, বিশেষ করে তাদের পরিবার কারণ তারা এর মাধ্যমে লাভবান হয়।

## তথ্য সূত্র

ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (BIGD) একটি গবেষণাপ্রকল্প হাতে নেয় ২০২২ সালে, যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামপর্যায়ে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন অনুসন্ধান করা, বিশেষ করে গত ২০ বছরে। মূল গবেষণা শুরু করার আগে একাধিক প্রাক-গবেষণা জরিপ ও আলোচনা সভা হয়, যার উদ্দেশ্য ছিল গবেষণা পদ্ধতি, এলাকা এবং সূত্র নির্বাচন ও নিরীক্ষা করা। বেশকিছু কাজ হয় মাঠে তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে যাতে প্রয়োজনীয় তথ্য সঠিকভাবে উঠে আসে। প্রাক-গবেষণায় পরিবর্তনের একাধিক সূচক নির্ণীত হয়, যার মধ্যে অভিবাসন ছিল অন্যতম।

গবেষণাপ্রকল্পের তথ্য সংগ্রহকারী মাঠকর্মী দল প্রায় ২০টি গ্রামে তাদের তথ্য অনুসন্ধান করে। তাদের তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ছিল এথনোগ্রাফি (নৃকুলবিদ্যা), যার ভিত্তিতে কয়েক হাজার ঘণ্টার আলাপ, সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলের তথ্য থাকার ফলে অভিবাসনের বিচিত্র চিত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। এই গবেষণা জরিপ সমতল ভূমির সকল ধরনের জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য (পাহাড়ি জনগোষ্ঠী ছাড়া)।

মাঠে সংগৃহীত তথ্যের বাইরেও অভিবাসন বিষয় নিয়ে মাঠ গবেষকদের সাথে যোগাযোগ করা হয় আরো বিস্তারিত জানতে। তবে সেটা ঘটেছে কেবল কয়েকটি ক্ষেত্রে। ৯৫% তথ্য জরিপ থেকে এসেছে।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসন গ্রামে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ, এবং এতে নারী অভিবাসীর জীবন ও পরিবর্তনের চিত্রও জড়িত। কিন্তু গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের পরিবর্তন। তাই অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের কর্মস্থলের ও শহরের বিবরণ বিষয়ক তথ্য ছিল না। সেটি সংগ্রহ করার জন্য একটি ক্ষুদ্র জরিপ চালানো হয় ঢাকার কুড়িল বস্তিতে। এটিকে সম্পূরক তথ্য সংগ্রহ বলা যেতে পারে।

গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল পরিবর্তনসমূহ শনাক্ত করা এবং একইসাথে বর্তমান অবস্থার বাস্তব বিবরণ। অতএব কোনো তাত্ত্বিক কাঠামোভিত্তিক উপসংহারে না গিয়ে এই নিবন্ধে বিবরণ ও বর্ণনায় সীমিত রাখা হয়েছে।

## ১. অভিবাসনের পূর্বের পর্যায়

মাঠপর্যায়ের তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, অভিবাসনের ব্যাপক প্রভাব গ্রামের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে পড়েছে। আবার, ব্যর্থ অভিবাসনের কারণে আর্থ-সামাজিক অবস্থা জটিল হয়েছে। কিন্তু অভিবাসনের ফলে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে অনেক বেশি। সাধারণত অভিবাসীরা বিদেশে যত আয় করে দেশে আনতে পারে সেটা কৃষি বা অন্যান্য খাতের আয় থেকে বেশি।

মাঠপর্যায়ের তথ্য থেকে জানা যায় প্রধানত কিছু কিছু এলাকা বাদ দিয়ে (যেমন খুলনার কিছু এলাকা) বেশিরভাগ মানুষ বিদেশ যাচ্ছে অর্থনৈতিক কারণে। মধ্যবিত্ত যাচ্ছে তার অবস্থা আরও উন্নত করতে। অপেক্ষাকৃত উচ্চবিত্তরা অবস্থা সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কম বিত্তের মানুষ মূলত অভ্যন্তরীণ অভিবাসন করে—ঢাকা বা শহরাঞ্চলে।

আমাদের গবেষণার পরিসর আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে দুটি বা কিছুক্ষেত্রে তিনটি মূল গন্তব্যের কথা শোনা যায়। প্রথমটি মধ্যপ্রাচ্য, দ্বিতীয়টি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং তৃতীয়টি ইউরোপ। এই তিন ধরনের অভিবাসনের পেছনে খরচ হওয়া সময় ও অর্থ এবং এর ফলাফলে অনেক পার্থক্য আছে।

তবে যেকোনো অভিবাসনের জন্যই বিনিয়োগ করতে হয়, অর্থাৎ অর্থের জোগাড় করতে হয়। কোন দেশে যেতে কত টাকা লাগে সেটা নির্ভর করছে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর, যেমন গন্তব্য, প্রবেশগম্যতা, যে যাচ্ছে তার অবস্থা, যে দালালের মাধ্যমে যাচ্ছে এবং যে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যোগাযোগ করেছে। অর্থাৎ সরলরৈখিকভাবে একজন মানুষ বিদেশে যেতে চাইলেই যেতে পারছে এটি পূর্বেও যেমন ছিলনা, এখনও তেমন নেই। কিন্তু যেহেতু বহু মানুষ বিদেশে গিয়েছে তাই প্রক্রিয়াটি অনেকের কাছেই জানা এবং আগের থেকে সহজগম্য। তবে অভিবাসনে আগে যে পরিমাণ অর্থ লাগতো বর্তমানে এর থেকে বেশি অর্থ প্রয়োজন হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি বিনিয়োগযোগ্য হয়ে উঠেছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মানুষ তাদের জমি বন্ধক দিতো বা বিক্রি করে দিতো। এখন নানা ধরনের মাধ্যম সংযোগ হয়েছে, যেমন, প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সুদভিত্তিক ঋণ। বিদেশ যাওয়ার টাকা কীভাবে জোগাড় হয় তার উত্তরে একজন গবেষণায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি জানান:

> ❝ সাধারণত যারা বিদেশ যায় তাদের টাকা জমা থাকে না। জমি বেচে বা বন্ধক দেয়। আবার কেউ কেউ আত্মীয়দের থেকে নিয়ে যাচ্ছে। এখানে মানুষের হাতের টাকা কমই আছে। এখানে নিম্নবিত্ত মানুষ বেশি যাচ্ছে। তাছাড়া দুবাই, সৌদি গেলে কম টাকা লাগে। সবাইতো কাজ করতে যায়। (বিধুভূষণ দাশ, কাশিপুর, আটগাও, শাল্লা, সুনামগঞ্জ)

অন্য একজনের অভিবাসনের তথ্য থেকে দেখা যায় অভিবাসী তার আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঋণ পরিশোধ করেছে। বেশি করে নগদ টাকা কামানোর উদ্দেশ্যে ২০০২/২০০৩ সালের দিকে কাশেম (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) সৌদিতে যায়। সেসময় প্রবাসে যেতে তার এক লাখ টাকা খরচ হইছিলো যা ছিল তার জমি বিক্রির টাকা।

এখানে দেখা যাচ্ছে পূর্বে জমি বিক্রি এবং বন্ধক দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষের থেকে ঋণ নেওয়া এখন বেশ সহজ হয়ে উঠেছে। অভিবাসনের জন্য ঋণ গ্রহণ পূর্বের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা পূর্বের থেকে সবল হয়েছে এবং এর ফলে বিভিন্ন মানুষের থেকে অভিবাসীরা ঋণ গ্রহণ করতে পারছে।

ঋণের পরিমাণ নির্ভর করছে কোন দেশে যাচ্ছে তার উপর। বিভিন্ন সূচকের কারণে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি বা

হ্রাস পায়। এছাড়া ঋণ শোধ করাটা অনেকবেশি সহজ হয়ে গেছে। কোনো গ্রাম থেকে কেউ যখন অভিবাসন করে সে একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যায় বা কারো সাথে পরিচিত হয়ে যায়। শুধু একজন মানুষ যাচ্ছে না। যতগুলো গ্রাম রয়েছে প্রায় সকল গ্রামেই একাধিক মানুষ অভিবাসন করেছে। এর ফলে একটা উৎসাহজনক পরিবেশ তৈরি হচ্ছে অভিবাসনের ক্ষেত্রে। ফলে মানুষের আস্থাও বেড়েছে ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে। লক্ষণীয় যে, ঋণ দেওয়া একটি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। কারণ যারা ঋণ দিচ্ছে তারা জানে এই বিনিয়োগের পরেও তাদের কাছে লভ্যাংশ ফেরত আসবে।

মইধ্যের বাড়ির (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) এক অভিবাসী খন্দকার বাড়ির একজনের কাছ থেকে ২ লাখ টাকা সুদসহ ফেরত দেওয়ার শর্তে ঋণ নিয়ে তার ফুফাতো ভাইয়ের সাহায্যে ২০১১ সালে ওমান পাড়ি জমায়। বড় ভাইয়ের বন্ধুর পরিচিত এক দালালের কাছ থেকে ভিসা কিনে ২০০৬ সালে সৌদি আরব যেতে মোতালেবের (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) প্রায় ৩ লাখ টাকা ঋণ করতে হয়েছে। এর মধ্যে কিছু টাকা আত্মীয়স্বজন থেকে বিনা সুদে নিয়েছেন এবং বাকি টাকাগুলো সুদ দেওয়ার শর্তে নিয়েছেন। কবির (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) বলেন: ২০১১ সালে চাচা আমারে দুবাই পাঠায়ে দেয়। টাকা লাগছে প্রায় ৩ লাখ। চাচা লাখে ৩০ হাজার সুদে টাকা আইনা দিছে, আর আমি একটা জমি বন্ধক দিয়া গেছি।

ব্যক্তিগত ঋণের সাথে যুক্ত হয়েছে এখন বিভিন্ন সংস্থার ঋণ। আমাদের তথ্যে ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার নজির না থাকলেও ঋণের অন্যতম উৎস হিসেবে এনজিওর নাম উঠে এসেছে। এছাড়া যেসব ব্যক্তি ঋণ দিচ্ছে তাদের সাথে এনজিওর সম্পর্ক আছে বলেই তারা ঋণ দিতে পারছে। এ প্রসঙ্গে ফকির চাঁদ (নয়াপাড়া, পি.এম. খালি, কক্সবাজার সদর) বলেন:

> “এলাকায় এনজিও খুব ভালো ভূমিকা পালন করতেছে। গ্রামের মানুষদের বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতা করেছে, যেমন ঘর করে দিচ্ছে, কৃষিকাজ করার জন্য ট্রাক্টর দিচ্ছে, মানুষকে বিভিন্ন প্রয়োজনে লোন দিচ্ছে। এনজিওর কাজ ২০–২৫ বছর আগে বর্তমান সময়ের মত ছিল না। আগে মানুষ মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে লোন নিত। কিন্তু এখন এনজিও থেকে তুলনামূলক কম সুদে ঋণ পাওয়া যায়।

একই প্রসঙ্গে লিটন সরদার (নলতা, ভুউমখারা, নড়িয়া, শরীয়তপুর) জানান লোন সাধারণত এনজিও থেকে নেয়—ব্র্যাক, নুসা, ব্যুরো বাংলাদেশ, জাগরণসহ আরও অনেক এনজিও।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে ঋণের কোন সুযোগ নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে এই সুযোগ-সুবিধাগুলো তারা পাচ্ছে।

ঋণের পরিমাণ ও পাওয়ার সম্ভাবনা অভিবাসন প্রত্যাশীর গন্তব্যের উপর নির্ভর করে। মধ্যপ্রাচ্যগামীর চেয়ে ইতালিগামীর ঋণ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

ব্যর্থ অভিবাসনের ক্ষেত্রে দেখা যায় মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে চেষ্টা করতে থাকে এবং একপর্যায়ে অনেকেই তারা যেতেও পারে। ফলে বর্তমানে ব্যর্থ অভিবাসনের ধারণাটা অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। যখন আজিজ দেওয়ানকে (নলতা, ভুউমখারা, নড়িয়া, শরীয়তপুর) প্রশ্ন করা হয় তার ভাইয়ের মত অনেকেই ব্যর্থ হয়েছে কিনা। তিনি বলেন:

> “অনেকেই হইছে ভাই। ২–৩ বার ব্যর্থ হয়ে তারপর ইতালি ঢুকছে এমন অনেক পরিবার আছে এই গ্রামে। আমাদের গ্রামে ইতালি যাইতে কেউ মারা যায় নাই কিন্তু পাশের গ্রামে মারা গেছে। একজনের লাশ দেশে আসছে আরেকজনের লাশই খুঁজে পায় নাই। বৈধভাবে লোক তো কম যায়, সবাই তো যায় অবৈধভাবে।

ব্যর্থ অভিবাসন করে ফেরত আসলেও দ্বিতীয়বার তারা ঋণ করতে পারছে। পরিবারের কাছ থেকে নেয়া ঋণের সবক্ষেত্রে সুদ দিতে হচ্ছে না। কিছুকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় জমি বিক্রি করে বা গহনা বিক্রি করে তারা ঋণ শোধ করেছে। নিলুফার (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) স্বামী জুবায়ের ২০০৯ সালে ওমান গিয়েছিলো। ওমান যেতে যে ৪ লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল সেগুলো তারা লাভে (সুদে) ধার নিয়েছিলেন। বিদেশে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি। ৪ বছর সেখানে থেকে বাংলাদেশে ফেরত চলে আসতে হয়েছে। বিদেশে থাকা অবস্থায় দেশে তেমন টাকা পয়সা পাঠাতে পারে নাই। দেশে এসে সুদে-আসলে প্রায় ৫ লাখ টাকা দিতে হয়েছে নিলুফার বাপের বাড়ির জমি বিক্রি করে।

ঋণ গ্রহণকারীর ঋণ ফেরত দেওয়া নিয়ে সন্দিহান হয়ে উঠলে ঋণ প্রদানকারী সাধারণত চাপ সৃষ্টি করে। তবে চাপের পরিমাণ কিছুটা কমেছে, কারণ অভিবাসনে সাফল্য বাড়ছে। বিদেশে কাজ করে অভিবাসীরা সাধারণত কিস্তির মাধ্যমে ঋণের টাকা ফেরত দেয়। অর্থাৎ একসাথে সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দিতে চায় না যেহেতু এটি একটি প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক ক্ষেত্র।

আগে পরিবারের কাছ থেকে ঋণ নেওয়ার যে প্রচলন ছিল সেটি এখনও রয়েছে। তবে লক্ষণীয়ভাবে এই চর্চা বিপদগ্রস্থদের মধ্যেই বেশি।

**আভিবাসনের জন্য অর্থ সংস্থানে ৪টি মূল পরিবর্তন হয়েছে**। প্রথমত, কৃষিকাজে আগে বড় অংকের টাকা নিয়ে কারবার ছিল না, তাই বিনিয়োগমূলক ঋণ গ্রহণের প্রবণতাও কম ছিল। কিন্তু অভিবাসনের ফলে গ্রামের মানুষ অনেক আয় ও ব্যয় করছে। এর ফলে এনজিওসহ বিভিন্ন সংস্থা এবং নতুন বিভিন্ন গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে যারা ঋণ দিতে আগ্রহী এবং প্রস্তুত।

দ্বিতীয়ত, মানুষ যেহেতু অনেকবেশি অভিবাসন করছে তাই ঋণ বিষয়ক নেতিবাচক ধারণাগুলো অনেকাংশেই কমে গিয়েছে। ঋণী, সুদখোর এসব বিষয় আর নেই। এটি স্বাভাবিক বিনিয়োগের একটি প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়েছে।

তৃতীয়ত, আগে যারা বিদেশে গিয়েছে তারা সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষ ছিল। অনেকসময় জমি বিক্রি করে তাদের যেতে হয়েছে। এখন জমি বিক্রি না করেও তারা যেতে পারে। কিছুকিছু ক্ষেত্রে তারা বন্ধক দেয় অথবা ঋণ নিয়ে বিদেশে চলে যায়।

চতুর্থ বিষয়টি হল, পূর্বে ঋণ দিত মূলত ব্যক্তি। কিন্তু ঋণের বাজার অনেক বৃহৎ হয়েছে। বর্তমানে ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

মানুষ তার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ভিত্তিতে অভিবাসন করছে। অর্থাৎ যারা একেবারেই অর্থহীন তারা অভ্যন্তরীণ অভিবাসন করছে। মধ্যবিত্তরা মধ্যপ্রাচ্যে যাচ্ছে। ইউরোপ অভিবাসীরা গ্রামে অন্যদের থেকে উপরের দিকে অবস্থান করে। কিছুটা হলেও তাদের লেখাপড়া জানতে হয় এবং কিছুটা হলেও ইংরেজি জানতে হয়। এর সাথে কিছু কারিগরি দক্ষতা থাকতে হয়। অতএব, গ্রামের মধ্যে অর্থনৈতিক অবস্থার কারণেও তিনটি শ্রেণি তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ফলে যারা যে অবস্থায় ছিল সেই অবস্থা থেকে সকলেরই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে, কিন্তু শ্রেণিসমতা এখনও অনেকদূরে।

## ২. অভিবাসীর অর্থ বিনিয়োগের খাত

এই গবেষণার মূল বিষয় হল গ্রামীণ সমাজের উপর অভিবাসনের প্রভাব এবং পরিবর্তন। গ্রামের অধিকাংশ লোক অভিবাসন করে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে। কিন্তু বিদেশে গিয়ে সবাই একই রকম কাজ করে না, আবার অনেকে এক কাজের জন্য গিয়ে অন্য কাজ করে। এর প্রধান কারণ অভিবাসীদের দক্ষতার পার্থক্য। গবেষণায় দেখা যায়, খুব কম মানুষ একটি কাজের উপর নির্ভর করে। যদিও তাদের পাসপোর্ট বা ভিসা তৈরি হয় মূলত বিশেষ একটি কাজের জন্য। কিন্তু এর বাহিরে তারা একাধিক কাজ করে এবং যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত হয়। কাজভেদে আয়ের ব্যাপক তারতম্য হয়। তাছাড়া আগে থেকে জানাশোনা ও যোগাযোগ আছে কিনা, তার উপরেও নির্ভর করে তাদের অবস্থা কিরকম হবে বিদেশে গিয়ে। তবে প্রায় প্রত্যেকেরই অবস্থা পূর্বে তুলনায় ভালো হয়। কতোটা ভালো হয় সেটা নির্ভর করছে কয়েকটি বিষয়ের উপর। যেমন কতদিন থাকলো, কী ধরনের কাজ করলো, কতগুলো কাজ করলো ইত্যাদি। লক্ষণীয় যে, দীর্ঘদিন বিদেশে অবস্থান না করলে অর্থনৈতিক অবস্থা মৌলিকভাবে পরিবর্তন হয় না। এই পরিস্থিতিতে ৩টি ভিন্ন ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়, তবে সেগুলোর কাঠামো একই। যদি মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইতালির অভিবাসীদের আমরা মূল আন্তর্জাতিক অভিবাসী হিসেবে দেখি, তাহলে দেখা যাবে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের অবস্থান কিছুটা হলেও ভিন্ন। ফেরত আসার পরেও তাদের অবস্থান ভিন্ন থাকে। মালয়েশিয়ার অভিবাসীদের অবস্থা খুব একটা ভালো হয়না। মধ্যপ্রাচ্যের অভিবাসীদের অবস্থা অনেকটা ভালো, যদিও ফিরে এসে অর্থ বিনিয়োগের পরিসর সীমাবদ্ধ থাকে। ইতালির অভিবাসীদের অবস্থা অধিক উন্নত হয়। অভিবাসীদের উপার্জিত অর্থ নানাভাবে ব্যবহার হয়। যেমন সৌদি আরবের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, অভিবাসীরা উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে তাদের কাছের আত্মীয়স্বজনদেরও তাদের কাছে আসেন।

> “ আমারে কামরাঙ্গীরচর জায়গা রাখার জন্য বহুত সাধছে, কিন্তু আমি বলেছিনা, আমার ছেলেপুলে বিদেশ না নিয়া, কিছুই করুম না। আমার ছেলে গেছে ফ্যামিলি ভিসায়। (শামসুদ্দিন চৌকিদার, নলতা ভুউমখারা, নড়িয়া, শরীয়তপুর)

অভিবাসীরা তাদের উপার্জিত অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্র মূলত ২টি—ব্যবসা বা জমি ক্রয়। আরেকটি ক্ষেত্র হল অন্যদের প্রয়োজনে অর্থ যোগান দেওয়া। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায় বিনিয়োগের দিকে তাদের আগ্রহ বেশি। গ্রামে যেহেতু এখন বাড়িঘর হচ্ছে, তাই অনেকে দোকান দেয়। অভিবাসীদের অর্থে প্রভাবে ক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণে বাজারগুলো সবল হচ্ছে। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বলা যায়, অভিবাসীদের আগের থেকে আয় এবং ব্যয় দুটিই বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকক্ষেত্রে অভিবাসী জমিজমা ক্রয় করে সম্মান অর্জন করার জন্য। কারণ অনেকেই অভিবাসনের আগে জমি বিক্রি করে গেছে বা পূর্বে তাদের বেশি জমি ছিল না। মূলত মধ্যপ্রাচ্যে অভিবাসনের ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায়। কেউ কেউ ব্যাংকে টাকা রাখে। কিন্তু উপার্জিত অর্থ নিয়ে ফেরত আসার পরে কোন ক্ষেত্রে তারা অর্থ বিনিয়োগ করবে তা সুস্পষ্ট নয়। ফলে এক্ষেত্রে তাদের অবস্থা পরিবর্তন হয়নি যতটা তাদের প্রয়োজন।

অভিবাসীদের পাঠানো অর্থে ব্যয় হচ্ছে মূলত পরিবারের জীবনযাপন ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা। জীবনযাপন উন্নত করা বলতে মূলত বাড়ি-ঘরের অবস্থা ফেরানোর কথা বোঝানো যায়। প্রায় সকলক্ষেত্রেই দেখা যায় অভিবাসী ফেরত এসে নিজের বাড়ি উন্নত করার চেষ্টা করে।

মজুমদার বাড়ির মোর্শেদার পরিবার (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) রেমিটেন্সের টাকায় ২০ লক্ষ বাজেট ধরে বিল্ডিং বানানো শুরু করেন। কিন্তু কাজ শেষ হতে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। বাড়ির ঠিক পেছনে জায়গা কিনে বাড়ি বড় করা হয়েছে এবং সেখানে একটা গরুর ঘর তৈরি করা হয়েছে।

দরবেশ বাড়ির মোতালেব (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) বাড়িতে আত্মীয়স্বজন আসলে কই থাকবে এই চিন্তায় বিল্ডিং করার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং ২০১৬ সালে বাড়ির কাজ শুরু করেন। কাজ শেষ করতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে যার পুরোটাই তিনি বহন করেছেন। এছাড়া আত্মীয়স্বজনদের জন্য বা নিজের ভাই-বোনকে বিয়ে দেওয়ার জন্য তারা উলেখযোগ্য অর্থ খরচ করে।

একটি কেস স্টাডি থেকে দেখা যায় যে, একজন অভিবাসী ১৭ বছর মধ্যপ্রাচ্যে রয়েছেন। তার দুই বোনকে বিয়ে দিয়েছেন। শ্বশুরবাড়িতে প্রয়োজনীয় ফার্নিচার করে দিয়েছেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনে দিয়েছেন, এবং দুই বোনের স্বামীকেই টাকা দিয়ে বিদেশ পাঠিয়েছেন। (মোতালেবের পরিবার, দরবেশ বাড়ি, ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা)। শামসুদ্দিন চৌকিদার (নলতা ভুউমখারা, নড়িয়া, শরীয়তপুর) বলেনঃ

> “ ধারদেনার পরিশোধ করে বাবা মায়ের ভরণপোষণ করে ছোটভাই বা বোন থাকলে তাদের বিয়ের খরচ দিতে হয়, আর এই অর্থ খরচ করার বদলে তার সামাজিক সম্মান আসে, কিন্তু আয় হয়না।

ঋণ পরিশোধ অভিবাসীদের অর্জিত অর্থ ব্যয়ের আরেকটি বড় খাত। ফেরত আসার পর তাদের যে ঋণ থাকে সেটা তারা প্রথমে পরিশোধ করে। কারণ তখন ঋণ পরিশোধ করার জন্য চাপ তৈরি হয়। যেহেতু ঋণগ্রহীতার পরিবার দেশে থাকে তাই তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করা সহজ হয়।

“আমার ইনকামের টাকা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করছি।” (ইউনুস, ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা)

> “ বিদেশ গিয়ে প্রথম যারা রেমিটেন্স পাঠায় তারা সর্বপ্রথম ধারদেনা শোধ করে। বিদেশ যাওয়ার সময় যারা সাহায্য করছিলো তাদের টাকা দিতে হয় আগে। (শামসুদ্দিন চৌকিদার, নলতা ভুউমখারা, নড়িয়া, শরীয়তপুর)

ঋণ গ্রহণের বিষয়টি মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একরকম এবং ইতালির জন্য অন্যরকম। এটি ভিন্ন এই কারণে যে, ইতালিতে যারা যায় তারা তুলনামূলকভাবে শিক্ষিত এবং তারা বেশি খরচ করে যায় অধিক উন্নতির আশায়। ইতালির অভিবাসীর অবস্থা অন্যদের তুলনায় বেশি ভালো এবং গ্রামের অর্থনীতির উপর তার নির্ভর করতে হয়না। অনেকসময় তারা চেষ্টা করে ইতালি থেকে ইউরোপের অন্য দেশে চলে যাওয়ার। অথবা যখন তারা দেশে ফেরত আসে তখন যে পরিমাণ টাকা নিয়ে ফেরত আসে তাতে তার ভবিষ্যতে তেমন আর অসুবিধা হয়না।

তবে লক্ষণীয় যে, ফেরত আসার পর যদিও তারা অনেক অর্থ আয় করে নিয়ে আসে কিন্তু সবসময় উপার্জিত অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ তারা পায়না। ফলে অনেকেরই কিছুটা আর্থিক সমস্যা থেকেই যায়। আমাদের গবেষণায় এও দেখা গেছে যে, উলেখযোগ্যহারে অভিবাসীদের পাঠানো অর্থ ঠিকমত কাজে লাগানো যায়না।

যেমন আমাদের মাঠ গবেষণায় দেখেছি একজন অভিবাসী সৌদি আরব এবং মালয়েশিয়াতে গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারেননি। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে ৮ বছরের মত ছিলেন। সেসময় যা আয় করতেন, খরচ বাদে বাকিটা দেশে পাঠিয়ে দিতেন, কখনো ব্যাংক বা কখনো হুন্ডি ব্যবস্থার মাধ্যমে। কিন্তু পরে তিনি জানতে পারেন তার মা তাকে না জানিয়ে ডেসটিনিতে টাকা ইনভেস্ট করেছিলেন। অতএব, অর্জিত অর্থ দেশে পাঠালেই যে সবসময় নিরাপদ থাকবে তা নয়।

একই রকম ঘটনা ঘটে মজুমদার বাড়ির মোর্শেদার পরিবারের (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) সুমনের ক্ষেত্রে। তিনি সৌদি আরবে একটানা পাঁচ বছর ছিলেন এবং সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে আট বছরের মতন প্রবাসে ছিলেন।

খরচ ছাড়া সব টাকা মাকে পাঠাতেন, মূলত ব্যাংকের মাধ্যমে। দেশে এসে ২টা গাড়ি কিনে আর দোকানপাট করে এখানে থেকে যাবেন বলে ভেবেছিলেন। কিন্তু এসে জানতে পারেন তার মা তাকে না জানিয়েই ডেসটিনি এবং মাল্টিপারপাসসহ আরেকটা এমএলএম বিজনেসে প্রায় ৭১ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেছেন এবং পরবর্তীতে আর কোনও টাকা ফেরত পাননি। ফলে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং দেশে বছর দুই থেকে সিদ্ধান্ত নেন আবার বিদেশ যাওয়ার। তাঁর স্ত্রীর ছোট ভাইয়ের সুবাদে এবার তিনি মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমান। কিন্তু যেই কাজের কথা ভেবে গিয়েছিলেন সেই কাজ তিনি পাননি এবং কোম্পানিতে বেতন অনেক কম হওয়ায় পরবর্তীতে সেই কোম্পানি থেকে তিনি পালিয়ে যান। তারপর থেকে তিনি অবৈধভাবেই সেখানে জীবন যাপন করছিলেন।

> “ গাড়ির পার্টস এর বিজনেস করছিলাম প্রথম। আমি বিদেশে আছিলাম, আমার ভাইদের টাকা দিয়া বিজনেস শুরু করছিলাম। সাথে আরও একটা বিজনেস ছিল। কাপড়ে রঙ করে না? এই কাপড়ের রঙ এর বিজনেস। এই দুই বিজনেস মিলাইয়া আমার প্রায় ২৬ লাখ টাকা লস যায়। আমার ভাইরাও আমার ১০ লাখ টাকা নিয়া ভাগে, এই মোট ৩৬ লাখ টাকা লস যায় আমার এই দুই বিজনেসে। পরে বেবি ট্যাক্সির, ইন্টার-ডিস্ট্রিক্ট ট্রাকের বিজনেস করি। এগুলাতেও লস খাই। (খন্দকার বাড়ি, ইয়াসিনের পরিবার, ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা)

নানা ধরনের পারিবারিক ও সামাজিক ব্যয়, ঋণ, উৎপাদনশীল খাতে অভিবাসনের অর্জিত অর্থ বিনিয়োগের সীমিত সুযোগ, এবং অনেকক্ষেত্রে অর্জিত অর্থ হারিয়ে ফেলা—এসব কারণে অভিবাসীরা দেশে ফিরে অর্জিত অর্থে টাকায় বেশিরভাগ সময়ই চলতে পারেনা। দেশে ফিরেও নানাভাবে আয়ের চেষ্টা করতে হয়। যেমন ইয়াসিনের এখন বসুন্ধরার ডিলারশিপ আছে, তার বড় ছেলে দেখে। একটা পাসপোর্টের ব্যবসা আছে, আর একটা অনলাইন ক্লিনিকের ব্যবসা আছে। আবার একজন বাবুর্চির বক্তব্য উলেখ করা যায়।

> “ ফেরত আইসা আমি আবার বাবুচিব্র কাম শুরু করছি। আল্লাহর রহমতে এটা ভালোই যাইতেছে। আশেপাশের গ্রামে যে কাউরে বললেই কবির বাবুর্চিরে চিনবো। নাম ডাক আছে আলহামদুলিলাহ্। ভালোই চলতেছে দেইখা আর বিদেশ যাই নাই। (কবির বাবুর্চি, ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা)

অনেকে পুনরায় প্রবাসে ফেরত যাওয়ার চেষ্টা করে। এর কারণ তারা প্রবাসে কয়ক বছর থাকার পর তাদের যোগাযোগ, অবস্থান ইত্যাদি তৈরি হয়ে যায় সেখানে। তখন তাদের পক্ষে অন্যান্য কাজ পাওয়া সহজ হয়। এজন্য তারা দেশে বিনিয়োগ করার চেয়ে প্রবাসে ফেরত গিয়ে তাদের পরিশ্রম করে বেশি লাভজনক মনে করে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, বিদেশে গেলে অবস্থান ভালো হচ্ছে। একই সাথে লক্ষ্য করা যায়, কোনও মানুষ দেশে ফিরে এসে গরীব হয়ে যায়না। কিন্তু বিদেশ থেকে ফেরত আসার পর একটি অর্থনৈতিকভাবে নিশ্চিত জীবনও সবসময় পাওয়া যাচ্ছেনা। অবস্থান ধরে রাখার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। আগে অনেকক্ষেত্রে কেউ যদি অর্থ নিয়ে ফেরত আসতো তাহলে, সে সেই অর্থ থেকেই খরচ চলতো। কিন্তু বর্তমানে সেটা সম্ভব নয় কারণ খরচের পরিমাণ বেশি।

অর্থনৈতিক পরিসরগুলো অনেকটাই সীমিত এখনো। আমাদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে দোকান করা, অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে পুঁজি লগ্নি করা এবং জমিজমায় অর্থ খরচ করাটাই প্রধান। কৃষিতে এখনও বড় আকারের পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত। তবে যেই পরিমাণ মানুষ বিদেশে রয়েছে সেই অনুপাতে সীমিত আকারে অর্থনৈতিক বাজার তৈরি হয়েছে।

## ৩. ব্যর্থ অভিবাসন

অভিবাসনের ক্ষেত্রে বড় চ্যালেঞ্জ হল ব্যর্থ অভিবাসন। যদিও বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২ থেকে ২.৫ কোটি মানুষ অভিবাসী এবং শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে বিভিন্ন স্থানে। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই অভিবাসন সম্পন্ন না করে ফেরত আসে। অভিবাসন ব্যর্থ বলা হয় মূলত যখন কেউ মাত্র ৩–৪ বছর বিদেশে থেকে চলে আসে বা আসতে বাধ্য হয়। এছাড়া যাওয়ার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে না পারাকেও ব্যর্থ অভিবাসন হিসাবে ধরা হয়।

ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যেতে না পারার বিভিন্ন কারণ আছে—অর্থনৈতিক কারণ, দালালের মাধ্যমে যেতে না পারা, অথবা কাগজপত্র সঠিকভাবে না আসা। অনেকক্ষেত্রে তারা ধোঁকাবাজির শিকার হয়। নানা কারণে বিদেশে  যেতে না পারাকে মূলত ব্যর্থ অভিবাসন বলা যায়।

অনেক সময় ভয়ংকরর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। যখন আজিজ দেওয়ানকে জিজ্ঞাস করা হল আপনার ভাই প্রথম কত সালে বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করে, তিনি বলেন:

> “প্রথম সে বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করে ৯৬ সালের দিকে। তখন সে রাশিয়া দিয়ে ঢোকে। কিন্তু রাশিয়া যাইয়া সে আর এয়ারপোর্ট থেকে বের হইতে পারে নাই। তার ভিসাটা জাল ছিল। পরে তারে রাশিয়া থেকে পাঠায় দিছে। দ্বিতীয়বার সে তুরস্ক দিয়ে গেছে। কিন্তু সেই বারও তাকে তুরস্ক দিয়ে ফেরত পাঠাইছে। তৃতীয়বার সেই গেছে লিবিয়া দিয়া। প্রথমে বাংলাদেশ থেকে লিবিয়া গেছে, সেখানে সে কিছুদিন কাজ করছে। তারপর সে একবার চেষ্টা করলো। এক দালালের লগে চুক্তি হইলো ২.৫ লাখ টাকায়। লিবিয়া থেকে নৌকায় উঠবে। যেখানে যাবে সেখানে যেতে সময় লাগে ৩–৪ ঘণ্টার মত। কিন্তু ৫–৬ ঘণ্টা হইয়া যায়, তাও গাড়ি চলতেই আছে, চলতেই আছে, গাড়ি আর থামেনা। তখন আমার ভাই ওই দালালরে ফোন দিল। বললো ভাই গাড়িতে এখনো চলতেই আছে গাড়িতে থামে না, কী করবো? তখন ওই দালালে কয় যে, ঠিক আছে সমস্যা নাই ওরা অন্য রাস্তা দিয়ে নিতেছে। কিন্তু গাড়ি আর অল্প একটু সময় চলার পরেই কয়েকজন লোক আটকাইলো। তাদের সবার হাতে অস্ত্র। তারপর ১০–১৫ দিন কোনো খোঁজখবর নাই। ভাইরে অনেক মারছে। মাইরা একেবারে শেষ কইরা দিছে। তারপরে বাড়িতে ফোন দিয়ে কইলো ১০০০০ ইউরো দেন। তখনই ইউরোর রেট ছিল ৯৫ টাকা কইরা। মানে সাড়ে নয় লাখ টাকা তাদের দিতে হবে। তখন কী করবো? তখন জমি বিক্রি করলাম। আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ধার করলাম, তারপর সে সাড়ে নয় লাখ টাকা পাঠাইলাম।
> (আজিজ দেওয়ান, নলতা, ভুউমখারা, নড়িয়া, শরীয়তপুর)

দ্বিতীয় ধরনের ব্যর্থ অভিবাসন হল, টাকা খরচ করে বিদেশে পৌঁছে সেখানে যেই কাজ পাওয়ার কথা সেই মানের কাজ না পাওয়া। ফলে এ ধরনের অভিবাসীরা নিজেকে সেখানে মানিয়ে নিতে পারেনা। অনেকক্ষেত্রে তাদের চাকরি চলে যায় বা তারা বিপদে পড়ে। কারণ হয়তো তাদের কাগজ ঠিক নেই বা যাদের মাধ্যমে গেছে তারা সৎ না। এমনকি কিছুক্ষেত্রে অভিবাসীদের কিছু সময় জেলে থেকে দেশে ফেরত আসতে হয়। এতে তারা সর্বস্বান্ত হয়ে যায়।

তৃতীয় ধরনের ব্যর্থ অভিবাসন হল যে পরিমাণ ব্যয় হয়েছে বিদেশে যেতে সে তুলনায় কম আয় করা। এই ক্ষেত্রে ব্যর্থতা আবার দুই ধরনের। একটি হল টাকা নিয়ে ফেরত এসেছে, কিন্তু সেই টাকা হয়তো নষ্ট করেছে বা ভুল জাগায় বিনিয়োগ করেছে। সেক্ষেত্রে এটিকে ব্যর্থ অভিবাসন বলা যেতে পারে কারণ সে কোনো সুবিধা পাচ্ছে না। অন্য আরেকটি বিষয় হচ্ছে তার যথেষ্ট পরিমাণ টাকা না নিয়ে ফেরত আসা।

এই অবস্থায় অনেকে দেশে ঋণের টাকাও পরিশোধ করতে পারে না বা পারলেও মৌলিক অবস্থা পরিবর্তন হয়না। অনেকের ফিরে এসে জমিজমা বিক্রি করতে হয় বা অন্যের থেকে ধার নিতে হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এছাড়া রয়েছে পুঁজি হারাবার ভয়। এই পুঁজি জমানো টাকা নয়, আবার পুরোপুরি ধারের টাকাও নয়। অনেক সময় জমি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়, তাই জমিও হারাতে হয়।

মজুমদার বাড়ির মোর্শেদার পরিবার (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) যেই কাজের কথা ভেবে গিয়েছিলেন সেই কাজ পাননি এবং কোম্পানিতে বেতন অনেক কম হওয়ায় পরবর্তীতে সেই কোম্পানি থেকে পালিয়ে যান। তারপর থেকে তিনি অবৈধভাবেই সেখানে জীবনযাপন করছিলেন। তিনি একটি সুপারশপে সেলসম্যান হিসেবে কাজ শুরু করেন। মামলা থাকায় চলাফেরায় ছিল সীমাবদ্ধতা। এই মামলা কাটানোর জন্য তিনি বেশ কয়েকবার দালালের কাছে টাকা পয়সা দিয়ে ধরা খেয়েছেন তবে শেষ পর্যন্ত তার এক পাঞ্জাবি বন্ধুর সহায়তায় এই মামলা থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। তিনি এখন দৈনিক প্রায় ১৪ ঘন্টা কাজ করেন বাংলাদেশি টাকায় ৭০–৮০ হাজার টাকা বেতনে।

বিভিন্ন দেশে গিয়ে বিভিন্ন অবস্থায় ব্যর্থ অভিবাসন ঘটে। অর্থাৎ ইতালির অভিবাসন যেটাকে আমরা তুলনামূলকভাবে সবল অভিবাসন বলতে পারি আয়ের দিক থেকে, সেখানে ব্যর্থতার হার কম। এর কারণ হল ইতালিতে গিয়ে কেউ এতো দুরবস্থায় পড়ে না। কিন্তু যে পরিমাণ টাকা খরচ করে সে ইতালিতে যায় সেই পরিমাণ টাকা অর্জন করতে হলে দীর্ঘ সময় তাকে সেখানে থাকতে হয়। একইসাথে, সে সাধারণত মধ্যবিত্ত শ্রেণির থেকে যায়, নিম্নবিত্ত নয়। অতএব তার ব্যর্থ অভিবাসনের অভিজ্ঞতা অন্যদের থেকে ভিন্ন। এমনকি জেল-জরিমানার বিষয়ও যদি চলে আসে সেই বিষয়টাও সামলে নেওয়ার মত অবস্থা তার থাকে

অভিবাসনের চেষ্টার সময় অভিবাসী সদস্যের পরিবার ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে। সামসুদ্দিন চৌকিদার (নলতা, ভুউমখারা, নড়িয়া, শরীয়তপুর) বলেন যে, ২০১৮ সালের পর যারা অবৈধভাবে লিবিয়ার সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু করেন তারা মাথায় রাখেন লিবিয়ায় জিম্মি হলে আরও ১০ লাখ টাকা লাগতে পারে। এই টাকার ব্যবস্থা করার জন্য সর্বোচ্চ ২ থেকে ৩ দিন সময় পাবেন।

কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশের অভিবাসন যেহেতু বেড়েছে তাই সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ অভিবাসন লক্ষ্য করা যায়না। ইতালি থেকে ফেরত আসা ব্যর্থ অভিবাসীর সংখ্যা তুলনামুলকভাবে কম। সবথেকে বেশি জনসংখ্যা যায় মধ্যপ্রাচ্যে এবং তাই সেখানে ব্যর্থ অভিবাসনের সংখ্যাও তুলনামূলক বেশি। আমাদের গবেষণাতথ্যও তা নির্দেশ করে। তবে সেখানেও ব্যর্থতার হার কমেছে। মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশিদের যে নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে সেই নেটওয়ার্কে মধ্যেও বসবাস করার সুযোগ রয়েছে। অর্থাৎ, পূর্বে যাদের ফেরার কথা ছিলো তাদের অনেকেই কাজ পেয়ে গেছেন।

গন্তব্যের ক্ষেত্রে ব্যর্থ অভিবাসন দেখা যায় মালয়েশিয়ায়। মালয়েশিয়া নিকটবর্তী দেশ এবং যোগাযোগ সহজ হওয়াতে অভিবাসী প্রত্যাশীদের যাওয়া সহজ। অবৈধভাবেও যাওয়া সম্ভব, এবং এতে খরচটাও তুলনামূলক কম। ফলে বেশি পরিমাণে মানুষ সেখানে যাচ্ছে। তবে এখন অবস্থা পাল্টেছে। মালয়েশিয়ায় আইন-শৃঙ্খলার বিষয়ে অনেক কড়াকড়ি হয়েছে ইদানিং। ওখানে কেউ যদি অবৈধ পথে যায় তাহলে প্রায়ই ধরা পড়ে সেই দেশে জেলে থাকতে হয়। পরবর্তীতে জেল থেকে সরাসরি দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া অভিবাসীরা বিভিন্ন বেআইনি কার্যক্রমের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে আর ফেরত আসা সম্ভব হয়না। অনেকের জেল খাটার অভিজ্ঞতা রয়েছে এবং গণমাধ্যমে আমরা তার চিত্র দেখতে পাই। ফলে বলা যায় ব্যর্থ অভিবাসনের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার অভিবাসন বিপজ্জনক।

অভিবাসনের আরেকটি গন্তব্য হলো ভারত, যেখানে সাধারণত ব্যর্থ অভিবাসনের ঘটনা দেখা যায় না। একবার সেখানে পৌঁছালে বেশিরভাগই কোনো না কোনোভাবে কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, আত্মীয়স্বজনদের খুঁজে পায় বা নিজেই থেকে যায়। তবে অনেকসময় দেশে ফিরে আসতে হয়, যেক্ষেত্রে এটি পুরোপুরি ব্যর্থ না হলেও অনেকক্ষেত্রে অসফল অভিবাসনে পরিণত হয়। অতএব গন্তব্যের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে অভিবাসনের ব্যর্থতা বা সাফল্য।

অবৈধ অভিবাসীদের ক্ষেত্রেও ব্যর্থতার হার বেশি। অবৈধ অভিবাসীদের সেই দেশের আইন সম্পর্কে কোনো ধারণাই থাকে না। ফলে সেখানে গিয়ে তাদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। সঠিক তথ্যদাতাদের কথা না শুনে অভিবাসীদের অনেকেই দালালের দেওয়া ভুল তথ্যের ওপর ভরসা করে। অবৈধ অভিবাসন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে কারণ মানুষ মনে করে অভিবাসিত হলেই তার অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। যেহেতু দেশে সে অভ্যন্তরীণ অভিবাসী হতে চায় না এবং দেশে সে অর্থনৈতিকভাবে যেসব সুযোগ-সুবিধা পায় সেগুলো তার কাছে যথেষ্ট নয়, তাই তার কাছে আন্তর্জাতিক অভিবাসন প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় সুযোগ নেওয়ার মানুষও তৈরি হয়ে গিয়েছে।

আরো যেটা উলেখ করা যায় সেটিকে অভিবাসন বলা যায়না। সেটি হল পাচার। এই বিষয় নিয়ে অনেক সংস্থাই কাজ করছে এবং পাচার হওয়া ব্যক্তিরা দেশে আসার পরে তাদেরকে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত করছে।

নারী এবং পুরুষের অভিবাসনের ক্ষেত্রে চিত্রটা কিছুটা ভিন্ন। মধ্যপ্রাচ্যে নারী অনেক সময় যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। ফলে সে ফেরত আসতে বাধ্য হয় অথবা সে বাধ্য হয়ে সেখানে থেকে যায়। সেই কারণে এটিকে আমরা সফল অভিবাসন বলতে পারি না।

অতএব দেখা যাচ্ছে অবস্থা, পরিস্থিতি এবং গন্তব্যের উপর নির্ভর করছে ব্যর্থ অভিবাসন। মাঠপর্যায়ের তথ্য বিশেষণ করে দেখা যায়, ১০ জনের মধ্যে ৩ জনের কাছ থেকেও ব্যর্থ অভিবাসনের অভিজ্ঞতা তেমন শোনা যায়নি। একাধিক স্থানে এই প্রশ্ন করে উত্তর পাওয়া যায়নি। অতএব এই সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যর্থ অভিবাসনের অবস্থান বা পরিমাণ কত সেটা নিরূপণ করা প্রয়োজন।

পরিবর্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায় অভিবাসী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ব্যর্থ অভিবাসী আগের তুলনায় কমেছে কিন্তু সংখ্যায় এখনও অনেক। সফল অভিবাসন যেমন গ্রামকে অর্থনৈতিকভাবে সবল করেছে তেমন ব্যর্থ অভিবাসন অভিবাসীকে দুর্বল করেছে। তবে পূর্বের মতো চিরস্থায়ী ব্যর্থ অভিবাসীর সংখ্যা কম বলে মনে হয় যেহেতু পুনরায় যাওয়ার সুযোগ আগের থেকে বেশি। ফলে অভিবাসী বারবার চেষ্টা করে। তবে ব্যর্থ অভিবাসনের ক্ষেত্রে ফেরত আসার পর সুযোগের অভাব একটি বড় বিষয়। যাওয়ার পূর্বেও যেমন সে জানতে পারছে না তার ভবিষ্যৎ, তেমন ফেরত আসার পরেও তার পক্ষে দেশে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়না। তবে এ বিষয়ে ইদানিং কিছু কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

## ৪. পারিবারিক পর্যায়ে সামাজিক পরিবর্তন

অভিবাসন একটি পরিবারের উপর বড় প্রভাব ফেলে, কারণ এর ফলে পরিবারের আর্থিক অবস্থা পাল্টে যায়। অভিবাসন একটি দুর্বল অর্থনৈতিক পরিসরে উলখযোগ্য অর্থায়ন ঘটায়। এর ফলে জিনিসপত্র কেনা থেকে শুরু করে বাড়িঘর তৈরি করা, বিয়ে, সামাজিক সম্পর্কসহ সকলকিছু প্রভাবিত হয়। এই কারণে অভিবাসনের সামাজিক প্রভাব বিশেষ করে পারিবারিক পর্যায়ে কী পরিবর্তন আনে সেটা দেখা প্রয়োজন।

গবেষণাতথ্য থেকে বোঝা যায় অভিবাসন মিশ্র ধরনের পরিবর্তন আনে। অভিবাসন বিষয়ে সাধারণত তিন ধরনের ভাবনা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, একদল মনে করে অভিবাসন মানেই ইতিবাচক এবং এর ফলে মানুষের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, একদল মনে করে অভিবাসন ইতিবাচক হলেও এর নেতিবাচক দিক রয়েছে, এর ফলে সনাতন পরিবারব্যবস্থা, পারিবারিক সম্পর্ক এবং বন্ধন দুর্বল হয়ে যায়। তৃতীয়ত দল মনে করে, অভিবাসনের ফলে একটি মৌলিক পরিবর্তন হচ্ছে। তারা মনে করে যে, যেহেতু এটি অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটায় ফলে অধিক পরিবর্তন হচ্ছে।

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়টি গবেষণায় পরিষ্কার উঠে এসেছে। আমাদের বেশিরভাগ তথ্য থেকে দেখা যায় অভিবাসনের পূর্বে তারা তুলনামূলক দরিদ্র ছিল, এখন বেশিরভাগেরই বাড়ির অবস্থা পরিবর্তন হয়েছে। এসব পরিবর্তনের বিষয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি বড় প্রভাব পড়ছে পরিবারের কাঠামোর ওপর। যৌথ পরিবারে থাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুই কারণই আছে। শুধু সামাজিক প্রথার কারণে নয়, অনেক সময় আলাদাভাবে বসবাস করার আর্থিক সামর্থ্য না থাকায় মানুষ যৌথ পরিবারে থাকতে বাধ্য হয়। অভিবাসীরা আগে চাইলেও আলাদা হয়ে যেতে পারতো না, এখন পারছে। তবে অভিবাসনের কারণে সমাজ ও পরিবার ভেঙে যাচ্ছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মোতালেবকে (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) যখন প্রশ্ন করা হয়, আপনার অভিবাসনের কারণে আপনার পারিবারিক বন্ধন এবং সম্পর্কে কোনো প্রভাব ফেলেছে কিনা। উত্তরে তিনি বলেন:

> “ না, আসলে পরিবারের সবাই আমরা ছোটবেলায় একসাথে কষ্ট করছি, এখনো সবাই সবার খেয়াল রাখি। তবে বিদেশ যাওয়ার কারণে আমি আমার ভাইদের অনেক সাহায্য সহযোগিতা করতে পারছি, তাই তেনারাও একটু ভালো চলতে ফিরতে পারেন।

অন্যান্য কেস স্টাডিগুলোর বিশেষণে দেখা যায়, অভিবাসনের ফলে পরিবারে মিশ্র ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে। অনেকেই বলছেন অভিবাসনের ফলে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত হয়েছে, তবে কেউ কেউ মনে করেন অভিবাসনের আগের সময়টাই ভালো ছিল—কারণ তখন সবাই একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতো। যেকোনো অর্থনৈতিক পরিবর্তন হলে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হবে এটি অবধারিত। এখানে সনাতনী ভাবনার সাথে একটি দ্বন্দ্বের সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, অভিবাসন কেবল পরিবারে নয়, সামগ্রিকভাবে সমাজে নতুন নতুন কাঠামো গড়ে তুলছে। কেউ এই পরিবর্তনকে স্বাগত জানাচ্ছেন, কেউ অস্বস্তি বোধ করছেন, কিন্তু পরিবর্তন যে ঘটছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

একইসাথে অনেকে বলছে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে টাকাই সম্পর্কের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মোতালেব (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) বলেন:

> “ আমার আপন চাচা আগে আমাদের তেমন পাত্তা দিতো না। একটু দূরে দূরে থাকতো, ভয় পাইতো কখন না আবার টাকা খুঁজে ফেলি। আমি বিদেশ যাবো শুইনা তাচ্ছিলো করছিলো, বিদেশ যাইতাম কেনো? বিদেশ থাইকা এক ছুটিতে আইসা চাচারে উত্তর দিছি “বিদেশ না গেলে আপনার ভাই (নিজের বাবা) না খাইয়া মরতো। এখন টাকা হইছে, সবাই সম্পর্ক ভালো রাখে। ফুপা-ফুপিরা আসে, বলে আমাদের জন্য অনেক দোয়া করছে যাতে আলাহ আমাদের দিকে তাকায়। যাক আলাহ আমাদের দিকে তাকাইছে দোয়া করুক আর না করুক। টাকা থাকায় এখন সবাই ভালো সম্পর্ক রাখে।

আবার খন্দকার বাড়ির (ভবানীপুর, কুমিল্লা) একজন সদস্য বলেন: "আত্মীয় স্বজনদের সাথে আমার পরিবারের সম্পর্কটা আগের থেকে মিলমিশ মানে ভালো হইছে। কারণ আগে তো অভাব আছিলো, এখন যখন আপনার ইনকাম আসতেছে আপনি আত্মীয় স্বজনদের ডাইকা ভালো মন্দ খাওয়াইতে পারবেন। এইভাবে সম্পর্ক ভালো হইছে।"

অন্যদিকে, যারা অভিবাসন করেনি তারা অনেকেই ভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞাতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। যেমন, লিটন সরদার (নলতা, নড়িয়া, শরীয়তপুর) বলেন: "যদি সত্য কথা বলি, আগে যদি মানুষ কলইশাক দিয়ে ভাত খেয়ে থাকলেও একজন আরেকজনরে দেখলে একটা ইজ্জত করতো, সম্মান করতো। এখন যদি গরুর গোশত দিয়েও ভাত খায়, একটা ভাব থাকে—'আমার ছেলে ইতালি থাকে, তোমারে অত গোনার টাইম নাই।' আগে এরকম ছিল না। আমাদের মামাতো ভাইদের একটা কবরস্থান নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব হইতাছে। আমারে যাইতে বললেও আমি যাই না। আগে তারা আছিলো একটা নরমাল ফ্যামিলি, তাদের মাঝে কত মিল মোহাব্বত আছিলো। এখন মামাতো ভাইরা সব থাকে ইতালি, এক মামাও থাকে। টাকার কোনও অভাব নাই। এক ইঞ্চি জায়গা কেউ কাউরে ছাড়ে না। উল্টাপুল্টা ঘর উডাই থুইছে। মিল-মোহাব্বত কইমা গেছে। কেউ কাউরে দেখতে পারে না। আগে এমন ছিল না।"

টাকা-পয়সার বিষয় বড় একটি ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক কারণে টাকা-পয়সার বিষয়টি সামনে চলে আসে এবং মানুষ খরচ করছে অনেকবেশি যা আগে করতো না। খরচ করতে গিয়ে কিছুক্ষেত্রে তারা বলছে তাদের একধরনের অপরাধবোধ হচ্ছে—আগে খরচ করতো না, কিন্তু এখন অনেক খরচ হচ্ছে। এছাড়া আগে মানুষের খোঁজ-খবর নিতো, কিন্তু এখন নেয় না।

একই প্রসঙ্গে আজিজ দেওয়ানকে (নলতা, নড়িয়া, শরীয়তপুর) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: "ভাই টাকা থাকলে সম্পর্ক এমনিতেই ভালো হয়। এখন হইলো মানুষের সাথে টাকার সম্পর্ক, আগে ছিল আন্তরিক সম্পর্ক।"

এটি পৃথিবীব্যাপী একটি ধারণা এবং এটিকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এর ইতিবাচক ও নেতিবাচক—দুই ধরনেরই প্রভাব আছে। এটিই বাস্তবতা। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের কারণে সামাজিক পরিবর্তন হতে বাধ্য। সমাজকাঠামো আগের মতোই থাকতে হবে, একইসাথে তারা অবস্থাপন্ন হয়ে যাবে এবং যৌথ পরিবার থাকবে, গবেষকের দৃষ্টিতে এটি অবাস্তব চিন্তা। যারা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তারা স্বীকার করে নিচ্ছে যে, সমাজ আর এক নেই। গবেষকের দৃষ্টিতে একে দেখতে হবে পরিবর্তনের সূচকে। ভালো-মন্দের সূচক ব্যবহার করলে এই বিষয়ে আলোচনা পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যেতে পারে।

মানুষের হাতে এখন টাকা রয়েছে এটি কেউ অস্বীকার করছে না। অভিবাসীরা বলছে তারা তখন গিয়েছিলো অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নতির জন্য। এর ফলে আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্কে অবনতি হয়েছে কিনা এই প্রশ্ন করলে অনেকেই বলেছে মানুষের হাতে এখন সময় কম।

একই প্রসঙ্গে খন্দকার বাড়ির (ভবানীপুর, কুমিল্লা) একজন সদস্য বলেন: "বিদেশ গেলে ভাই সবার সাথেই সম্পর্ক একপ্রকার ছিন্ন হইয়া যায়। কারণ নিজেরেই সময় দেওয়ার সময় থাকে না, আত্মীয়স্বজনদের কখন সময় দিবো? দেশে থাকলে যেমন দেখাসাক্ষাত হয়, একটা ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক থাকে। আপনে বিদেশ গেলে শত চেষ্টা করেও আপনি এই ঘনিষ্ঠতা টিকায় রাখতে পারবেন না যতই ফোন করেন।

বস্তুতপক্ষে, সময় সম্পর্কে ধারণা পূর্বে কম ছিল। সময়ের মূল্য তৈরি হয়েছে। যেহেতু তারা অনেক বেশি অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয়, তাই তারা সময়ের কথা অনেক বেশি বলছে। একই সাথে এটিও উলেখ রয়েছে

যে, বাজারে গিয়ে সবাই মিলে চা-পানি খাচ্ছে। অর্থাৎ সম্পর্ক রক্ষার নয়া পরিসর তৈরি হচ্ছে।

সুতরাং, এই পরিবর্তনকে কোনো একক সূচকে মাপা সম্ভব নয়। বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে, এটি এক ধরনের মিশ্র সমীকরণ—যার বিভিন্ন দিক, অভিজ্ঞতা ও প্রভাব একসাথে মিলে এক জটিল বাস্তবতা তৈরি করছে।

অর্থনীতি যে পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি—তা নানা দিক থেকে স্পষ্টভাবে উঠে আসছে। আগের তুলনায় এখন মানুষের বিয়ের আয়োজন বড় ও ব্যয়বহুল হচ্ছে, খরচের মাত্রাও বেড়েছে। তবে একইসাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনও ঘটেছে—আগে যারা উপার্জন করতো, তারা অর্থ পাঠাতো বাবা-মার কাছে; এখন অনেকসময় বিয়ের পর সেই অর্থ যায় স্ত্রীর হাতে। এর ফলে পারিবারিক সম্পর্কে গঠন ও ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন এসেছে। অর্থাৎ, আগে যে উপার্জন করতো সেই ছিলো পরিবারের প্রধান; এখনো সেই ধারা বজায় আছে—যার হাতে অর্থ, সিদ্ধান্তের ক্ষমতাও মূলত তার। এই রূপান্তর অবধারিত ছিল।

এ ব্যাপারে আলমগীর ব্যাপারী (নলতা, নড়িয়া, শরীয়তপুর) বলেন: "আগে যৌথ পরিবার বেশি ছিল। ৪ ভাই বিদেশ গেলে সবাই বাবার হাতে টাকা দিতো। বাবা পরিবারের নেতৃত্ব দিতো। বাবা যেভাবে চালাইতো, সেভাবেই চলত। এখন যাওয়ার পর যার যার চিন্তা তার তার, বাবা-মারেই ঠিকমত টাকা দেয় না। বেশিরভাগই এমন। আবার, শামসুল হক হাওলাদারকে (নলতা, নড়িয়া শরীয়তপুর) বাবা-মায়ের সাথে অভিবাসী সন্তানের সম্পর্ক নিয়ে জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন:

> “ সম্পর্ক খারাপ না। কারো কারো সম্পর্ক খুব ভালো, কারো সম্পর্ক একটু খারাপ। আগে তো ছেলে বিদেশ থাকলেও টাকা পাঠাইতো বাবার কাছে। আর এখন টাকা পাঠায় বউয়ের কাছে। আগে বউ চলতো শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে। আর এখন শ্বশুর চলে পুতের বউয়ের কাছ থেকে টাকা নিয়ে।

তবে পরিবারের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোর এই পরিবর্তন ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক এই বিষয়ে গবেষক হিসাবে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে কিছুকিছু ক্ষেত্রে এটি নেতিবাচক বলা যায়, যেমন আর্থিক কারণে পারিবারিক দ্বন্দ্ব। এই ব্যাপারে লিটন সরদার (নলতা, নড়িয়া শরীয়তপুর) বলেন:

> “ আগে আমাদের গ্রামে যৌথ পরিবার ছিল, বর্তমানে ছোট পরিবার বেশি। পরিবার আগেও ভাঙতো, কিন্তু একটা সময়ের পর। ছেলেমেয়ে বড় হলে তারপর। এখন বিয়ের পরেই পরিবার ভাগ হয়ে যায়। ধরেন, আপনারা ৩ ভাই বিদেশে থাকেন। আপনাদের ভাইদের মাঝে কোন দ্বন্দ্ব নাই কিন্তু আপনাদের বাড়িতে যে ৩ চেয়ারম্যান আছে, তাদের মাঝে শুরু হয় দ্বন্দ্ব, সবাই তো আর এক সমান কামাইতে পারে না। এখন যার স্বামী বেশি কামায় সে তো বলবে—আমার স্বামী বেশি টাকা কামায়, আমি এই কাম করমু কেন? ঐ কাম করমু কেন? এরকমভাবে তাদের মাঝে দ্বন্দ্ব হয়ে গেলে ১ দিন, ২ দিন, একসময় আলাদা হয়ে যায়। এইটা সব ফ্যামিলিতেই আছে কম-বেশি। ২০০০ এর আগে আমাদের গ্রামে যৌথ ফ্যামিলি বেশি ছিল, ভাইয়েরা একসাথে কাজ করছে, থাকছে, দ্বন্দ্ব হত না এমন না, কিন্তু দিনশেষে একসাথেই থাকতো। একসাথে থাকতে গেলে দ্বন্দ্ব হবেই। আপনার সবকিছু যেমন আমার পছন্দ হবে না, আমার সবকিছু আবার আপনার পছন্দ হবে না।

তবে এই ধরনের বক্তব্য অভিমান বা আকাঙ্ক্ষাপ্রসূত হতে পারে।

দেখা যায় বর্তমানে অন্যকে সাহায্য করার প্রবণতা অনেক বেড়ে গিয়েছে, যদিও মানুষ বলছে তাদের হাতে সময় নেই। সময় নেই ঠিক, তবে যেহেতু অভিবাসীর হাতে অর্থ আছে তাই সে অন্যকে সাহায্য করছে। এর

ফলে সমাজে তার সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতএব অর্থে ভূমিকা একাধিক ক্ষেত্রে প্রসৃত। শুধুমাত্র টাকার জন্য সে করছে না, সে সম্মান পাওয়ার জন্যও করছে।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসন যদিও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের চেয়ে অনেক কম অর্থ নিয়ে আসে, এখানেও লক্ষণীয়ভাবে অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। অভ্যন্তরীণ অভিবাসন সাধারণত দরিদ্র জনগোষ্ঠীরা করে থাকে। সে যখন অর্থ নিয়ে ফেরত আসে, তখন তার অবস্থা ভালো হয়।

গোবিন্দকাঠির পদ্যোত সরকারকে (দক্ষিণ শ্রীপুর, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা) জিজ্ঞেস করা হয় গ্রামের বাইরে কাজ করতে যাওয়াতে তার পরিবারে কোনো পরিবর্তন এসেছে কিনা। উত্তরে তিনি বলেন:

> “আমার গ্রামের বাইরে থাকাতে আমার পরিবারের তেমন কোনো পরিবর্তন আসেনি। তবে, আমি পূর্বে অনেকবেশি ঋণী ছিলাম গ্রামের বাইরে কাজ করতে যাওয়ার মাধ্যমে এসব ঋণ পরিশোধ করে আমি মোটামুটি চাপমুক্ত হইছি।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের প্রভাব যদিও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের তুলনায় কম, কিন্তু এর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে গ্রামের দরিদ্র বা অতিদরিদ্র পরিবারের উপরে। অর্থনৈতিক উন্নতির কারণে পরিবারের সম্মান বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রেও টাকা যার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সেই বাড়ির প্রধান হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে অনেক সময় দেখা যায় নারীর অবস্থান সবল হচ্ছে অভিবাসীর স্ত্রী হিসেবে।

পদ্যোত সরকারের অবর্তমানে পরিবারের দায়িত্ব কে সামলায় জানতে চাইলে তিনি বলেন:

> “আমি যখন গ্রামের বাইরে থাকি তখন পরিবারের কাজগুলো আমার বাড়ির গৃহিণী সামলায়। তিনিও বিভিন্ন বাড়িতে জনের (শ্রমিক) কাজ করে। আমি যেহেতু কোন চাষাবাদ কিংবা মাছ চাষ করি না, সেকারণে আমার গ্রামের বাইরে গেলে তেমন কোনো সমস্যা হয় না। আবার, গ্রামের বাইরে কাজ করতে যাওয়ার মাধ্যমে আমার পরিবারের কিছু শৃঙ্খলাও যুক্ত হয়। যেমন গ্রামের বাইরে থাকাকালীন অবস্থায় আমার পরিবারের সকল সিদ্ধান্ত নেয় আমার স্ত্রী। তিনি খুব হিসেব করে চলাফেরা করেন এবং খরচ করেন। পরিবারের সিদ্ধান্তগুলো তিনি নেন। অর্থাৎ আমি যখন গ্রামের বাইরে থাকি তখন আমার পরিবারের কর্তা হিসেবে আমায় গৃহিণী দেখাশুনা করে।

এছাড়াও অনেকের থেকে আমরা জানতে পারি পরিবারের পুরুষ সদস্য বিদেশে থাকলে বাজারসদাই পরিবারের নারীরাই করে। “মহিলারা মার্কেটে আসতেছে, বাজারে যাইতেছে, মার্কেট করতেয়াছে। খুব কম ফ্যামিলিই আছে মহিলারা মার্কেটে যায় না, খুব কম, রেয়ার, দুই একটা ফ্যামিলিতে নাই আর সবাই যায়। নিজেদের মত করে নিজেরা বাজারসদাই করে। আর ফেরি দিয়া যে মাছ বিক্রি করে এইডা তো ইদানিং আইছে, ৪–৫ বছর। তরিতরকারিও আইয়ে, মাছও আইয়ে। তরিতরকারিডা আইয়ে বছর দুয়েক হইবো। আগে তরিতরকারি আসতো না গেরামে। আগে ছোট ছোট কিছু কানের দুল, কিছু গয়নাগাটি বিক্রি করতো ফেরি কইরা। এইডি এখন আর দেখি না ৩–৪ বছর ধইরা। হেরপর হরেক মালডাও ২–৩ বছর ধইরা আইছে। পাতিলওয়ালারা আইতো, সিলভারের পাতিল টাতিল এগুলি আসতো। এগুলি বাজার থেইকা না, মহিলারা এইগুলি গেরাম থেইকাই কিনতো। আবার পুরান পাতিলও নিয়ে যাইতো আর নতুন দিয়া যাইতো।” (খন্দকার বাড়ি, ইয়াসিনের পরিবার, ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা)

পরিবারে নারীদের ভূমিকায় পরিবর্তন এসেছে। স্বামী বিদেশে থাকার কারণে একক পরিবারের বউরা বাড়ির কর্তার ভূমিকা পালন করে। বাজার করা, বাচ্চাদের পড়াশোনাসহ সব কিছু বউরা দেখাশুনা করে যা গত ২৫ বছর আগে ছিল না। (আবদুলাহ, নয়াপাড়া, পি.এম খালি, কক্সবাজার সদর)

আমাদের গবেষণারতথ্য বিশেষণ করে দেখা যাচ্ছে অভিবাসন নেতিবাচক এটি কেউ বলেনি। বরং অধিকাংশের মতে, অভিবাসনের ফলে সমাজে পরিবর্তন ঘটছে। তাই ধরে নিতে হবে এটি একটি মৌলিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন যা সমাজের সকল পরিসরের উপর প্রভাব ফেলছে। এর ফলে কিছু ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে যা মানুষ মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। গবেষণাকালে যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে তারা ক্রান্তিকালীন পরিস্থিতি থেকে তাদের সাক্ষাৎকার দিয়েছে। অর্থাৎ একটি অবস্থান থেকে অন্য একটি অবস্থানে যাওয়ার কালে যে পরিবর্তন হচ্ছে সেই পরিবর্তনের সাক্ষী তারা। কখনও পছন্দ করছে। আবার কখনও পছন্দ করছে না।

## ৫. রাজনৈতিক পরিবর্তন

অভিবাসনের ফলে গ্রামে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবের সাথে সাথে সামাজিক সংগঠনগুলোতেও পরিবর্তন দেখা যায়। সমাজকে সবল রাখার প্রতি মানুষের আগ্রহ দেখা যায়। এই ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে রাজনীতি। গ্রামীণজীবনে রাজনীতি এককভাবে উপস্থিত হয়না। অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে রাষ্ট্রচিন্তা থেকে দলীয়রাজনৈতিক ভাবনা তৈরি হয়।

আমাদের গবেষণার বিভিন্ন তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, গ্রামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়নি। রাজনীতির অনেক সনাতনী প্রথা ও প্রক্রিয়া এখনো বহাল রয়েছে, যদিও সেগুলো ধীরেধীরে পরিবর্তিত হচ্ছে। এখানে মানুষ তার পরিবার, গোষ্ঠী বা বাড়ির পরিচয়ে রাজনীতি করে। সকলক্ষেত্রে অর্থে ভূমিকা আগের মতই ব্যাপক, তবে অর্থে ধরন পাল্টেছে। পূর্বে সমাজের ক্ষমতাবানরা মূলত ছিল সনাতনী ধনী গোষ্ঠী—যাদের প্রধান সম্পদ ছিল জমি। কিন্তু বর্তমানে যারা নতুনভাবে ক্ষমতাবান হচ্ছে, তাদের প্রভাবের মূল ভিত্তি নগদ অর্থ।

এই নব্য ক্ষমতাবানদের মধ্যে উলেখযোগ্য আন্তর্জাতিক অভিবাসীরা, যাদের অর্থে কারণে রাজনৈতিক প্রভাব সৃষ্টির বেশ কিছু উদাহরণ মাঠকর্মে উঠে এসেছে। তবে এখন মানুষ ব্যবসা করেও অবস্থাপন্ন হচ্ছে। ফলে তারাও ক্ষমতাকাঠামোর সামনে চলে আসছে।

অভিবাসনের ফলে সামাজিক ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে। আমাদের গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যে, পূর্বে মাদ্রাসাকমিটি যখন তৈরি হয় তখন বয়স্ক মানুষ বা ধর্মীয়নেতা প্রধানত কমিটিতে থাকতো। কিন্তু বর্তমানে প্রধান না হলেও কমিটিতে অভিবাসী গোষ্ঠীরা প্রধানের মতই অবস্থান করে। অর্থাৎ গ্রামের পুরাতন রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে নতুন কিছু গোষ্ঠী প্রবেশ করছে এবং মৌলিকভাবে ক্ষমতার সূচকগুলোকে প্রভাবিত করেছে।

এই সূচকগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি মানুষ অভিবাসনকে শুধু অর্থনৈতিক নয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথ হিসেবেও দেখছে। তবে শুধু অভিবাসনের ফলে আর্থিকভাবে সবল হলেই সামাজিক ও রাজনৈতি ক্ষমতা আসছে না। যেটি লক্ষণীয়, অনেক অভিবাসী ফেরত আসার পর কিছুটা সময় নিচ্ছে নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে। যেহেতু গ্রামের সাথে তারা সবসময় যুক্ত নয়, ফলে অনেকক্ষেত্রেই ফেরার পর তারা পরিস্থিতি না বুঝে কোথাও জড়িত হয়না।

স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোতে প্রবাসীদের কোনো ভূমিকা আছে কিনা বা এক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কিনা — এ প্রসঙ্গে জানা যায় যে, প্রবাসীরা এলাকারা বিভিন্ন খেলার আয়োজনে আর্থিক সহায়তা করে। ৫–৬ বছর ধরে এই প্রচলন শুরু হইছে। তারা মনে করে এতে সম্মান বাড়ে। (আব্দুল হকের পরিবার, ভবানীপুর, কুমিল্লা)

অর্থবান মানেই প্রভাবশালী। এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা। কিন্তু অর্থবান মানে রাজনৈতিকভাবে সে প্রভাবশালী এটি নয়। গ্রামের মধ্যে ক্ষমতার যে অন্তর্জাল রয়েছে এটি বহুমাত্রিক। নয়া প্রতিপত্তি তৈরি হচ্ছে এবং পুরাতন প্রতিপত্তি রূপান্তরিত হচ্ছে। এই রূপান্তরের চিত্রটি অবধারিত ছিল কারণ অভিবাসীরা অর্থ নিয়ে আসছে। গবেষণাতথ্যে এমনও পাওয়া যায় যে, অর্থ ছাড়া রাজনীতি নেই।

তবে অভিবাসন না হওয়ার ফলে পূর্বে প্রভাবশালীরা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ছে সেটা লক্ষ্য করা যায়না। কীভাবে টিকে থাকতে হয় প্রভাবশালীদের সেই পদ্ধতি জানা আছে। আরো মনে রাখতে হবে এখনপর্যন্ত বেশিরভাগ অভিবাসন হয়েছে আগে থেকেই প্রভাবশালী পরিবার থেকে, কারণ অভিবাসনের জন্য টাকা প্রয়োজন। তাই অভিবাসীদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব অনেকাংশেই সনাতনভাবে প্রভাবশালীদের আরো শক্তিশালী করছে। ফলে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি হচ্ছে। অতএব বলা যায় গ্রামে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা অনেক বেড়ে গেছে। এটি রাজনীতির ক্ষেত্রে বড় একটি সূচক।

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের জায়গা থেকে দেখা যায় যে যদিও সনাতনী প্রতিষ্ঠান, যেমন সালিশকেন্দ্র এখনও রয়েছে, কিন্তু একইসাথে ইউনিয়ন কাউন্সিলর বা ওয়ার্ড কাউন্সিলরের প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এখানে অভিবাসনের একটা ভূমিকা আছে, কারণ এখন অভিবাসন করতে গেলে বিভিন্ন কাগজ, দলিল ইত্যাদির প্রয়োজন হয় ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কাছ থেকে। এর ফলে ওয়ার্ড কাউন্সিলের সদস্যরা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তারা অভিবাসীদের যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করছে। তাদের সহযোগী মনোভাবের প্রধান কারণ অভিবাসীরা সাধারণত আগের চেয়ে আর্থিকভাবে সবল হয়ে ফেরত আসে এবং ফিরে আসা অভিবাসীরা তাদের সমর্থন করবে। অতএব গ্রামে যে সামাজিক শক্তির একক কাঠামো ছিল আগে, এখন সেখানে মিশ্রশক্তি তৈরি হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদে যাওয়ার কারণগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তথ্যদাতারা জানায় চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট, জন্ম নিবন্ধনে চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর লাগে, পাসপোর্টেও চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট লাগে। ব্যবসায়ের ডিল হলে চেয়ারম্যানের অফিসে যায়, সাথে মুরুব্বি থাকে। ভার্সিটিতে ভর্তি হইতে লাগে চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট। ৪–৫ বছর ধইরা লাগে, তার আগে লাগতো না এতকিছু। (সূত্র: আব্দুল হকের পরিবার, ভবানীপুর, কুমিল্লা)

**কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ বলেছে অভিবাসীদের নতুন প্রভাব হয়নি।** যেমন মোশারফ মজুমদারকে (ভবানীপুর, কুমিল্লা) জিজ্ঞেস করা হয় আপনাদের গ্রামে গত ১০–১২ বছরে এমন কেউ নাই যে কাউকে গুনতেছে না, কোনো একটা ক্ষমতা হইছে তার? উত্তরে তিনি বলেন: "এরকম যে নাই সেটা বলবো না, কিন্তু এগুলা হলো বেয়াদব। কিন্তু অনেক টাকা হওয়ায় যে কাউকে গুনতেছে না বিষয়টা এমন না। আর বেয়াদবগুলা দলের কারণে একটু গরম দেখায়। কারণ আপনার নেতৃত্ব খারাপ, রাজা খারাপ হইলে প্রজা ভালো হইবো কেমনে? ভবানীপুরে কেউ টাকার গরম দেখায় না। খন্দকার বাড়িতে একজন আছে যার কোটি কোটি টাকা, চেয়ারম্যানের থেকে বেশি অর্থে মালিক, কিন্তু দেশে আসলে একদম ভদ্র।"

আবার অনেক অভিবাসী রাজনীতিতে জড়াতে চাননা বিভিন্ন বিবেচনায়। লিটন সরদারের (নলতা, নড়িয়া শরীয়তপুর) বক্তব্য এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন:

> আমি ইতালি থাকি, আমার ভাই দেশে রাজনীতি করে, তারে আমি কিছু টাকা দিলাম। রাজনীতি করতে টাকা লাগে তো। আমারেই এক ছেলে বলছে, আপনি যদি কোনো পদবী নিতে চান পোস্টার আর ব্যানারের সব খরচ আমার। সে আমার রক্তের সম্পর্কে কেউ না। তারও স্বার্থ আছে, আমি ভাল পদে থাকলে সে গ্রামে আসলে তার আলাদা একটা সম্মান থাকবে। আমারও তারে দেখতে হইবো, সে আমারে দুঃসময়ে উপকার করছে, তারেও তো আমার মনে রাখা লাগবো। তার জমিজমা, আত্মীয়স্বজনের কোন বিপদ হইলে আমারে দেখতে হইবো। কিন্তু তারা সরাসরি রাজনীতিতে জড়াইতে চায়না, মামলা খেয়ে যাওয়ার ভয়, গ্যাঞ্জামের ভয়। এগুলার জন্য তারা আসে না। এই এলাকায় রাজনীতি করা আরও খরচ। যে বিদেশ থেকে ফিরে আসছে, সে হয়ত তার ছেলেকে বিদেশে রেখে আসছে, তার মাসে মাসে টাকা আইতাছে, আবার তার নিজের টাকা তো আছেই। রাজনীতি করলে আরও টাকা যাইবো। এই এলাকায় রাজনীতি করে লাভ নাই।

অতএব কয়েকটি গোষ্ঠী যারা পূর্বে প্রভাবশালী ছিল এবং নতুন প্রভাবশালী হচ্ছে এমন গোষ্ঠী রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে। তবে গ্রামে আর্থ-সামাজিক কারণে কেউ কারো উপর উঠে চলে যাচ্ছে এমন তথ্য পাওয়া যায়না।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসীদের আর্থিক সংগতি কম বিধায় তাদের রাজনৈতিক প্রভাবও তুলনামূলকভাবে কম। তবে আমাদের গবেষণায় দেখা যায় যে, যেসকল পুরুষ অভিবাসী বর্ষাকালে অভিবাসন করছে না, তারা সেসময়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। কিন্তু একাধিক অভিবাসীকে প্রশ্ন করেও এর সদুত্তর পাওয়া যায়নি, যদিও খুব কমসংখ্যক অভিবাসী বিষয়টি সরাসরি অস্বীকার করেছে। অতএব ধারণা করা যায় এভাবে রাজনীতিতে জড়িত হওয়া তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের একটি অংশ, যার মাধ্যমে তারা নিজেদের অবস্থানকে কিছুটা সবল করার চেষ্টা করে।

গ্রাম থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণি বেশি আন্তর্জাতিক অভিবাসন করে থাকে। সামাজিক দিক থেকে তারা বেশি সম্মানিত। কিছুসংখ্যক নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ আন্তর্জাতিক অভিবাসনে যাচ্ছে। গত পাঁচ বছরে যার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন যেহেতু পূর্বে তুলনায় বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে টাকা সংগ্রহ করা সহজ হয়ে গিয়েছে ফলে নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষও অভিবাসী হচ্ছে। কিন্তু এই নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষ ফেরত এসে গ্রামে প্রভাব ফেলেছে বলে লক্ষ্য করা যায়না। এই শ্রেণির বিদেশগমনের রাজনৈতিক প্রভাবের পরিবর্তন বোঝার জন্য আমাদের কিছুকাল অপেক্ষা করতে হবে।

## ৬. অভ্যন্তরীণ অভিবাসন

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সমাজ এবং অর্থনীতির ওপর ব্যপক প্রভাব রাখছে। তবে আন্তর্জাতিক অভিবাসনের বহু আগে থেকেই অভ্যন্তরীণ অভিবাসন নীরবে ঘটে চলছে প্রতিনিয়ত, যার প্রভাব দৃশ্যমান না হলেও গভীর। যেখানে মূলত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত গ্রামীণ পরিবার থেকে মানুষ বিদেশে যায়, অভ্যন্তরীণ অভিবাসন মূলত করে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ। যেটা ঐতিহাসিকভাবে অতিদরিদ্র মানুষ তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা থেকে মুক্তির একটি পথ হিসাবে দেখে। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের লক্ষ্য জীবনমান উন্নত করা, যাতে ভবিষ্যতে দারিদ্র্যের মুখোমুখি না হতে হয়। অন্যদিকে, অভ্যন্তরীণ অভিবাসন মূলত দারিদ্র্য থেকে বাঁচার

জন্য—জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে। অর্থাৎ, উভয়ক্ষেত্রেই অভিবাসনের সঙ্গে বেঁচে থাকার একটি গভীর প্রয়াস জড়িত থাকে।

> “মানুষ পাটগ্রাম, বাউরা, বড়খাতা, সানিয়াজান, শটিবাড়ির লোকজন বোরো রোয়া গারার জন্য (ধান লাগানোর সময়) সময় টাঙ্গাইল যায়। কিছু লোক রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম যায়। একটা দল কন্টাক্টরি (ঠিকাদারি) কাজ যেমন ব্রিজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট নির্মাণ ও মেরামতের কাজে যায়। হাজিরা ৫০০ টাকা। চুক্তি হলে মজুরি বেশি পায়। কাজও বেশি করে টাকা যে যেরকম নিতে পারে। এক্ষেত্রে দেখা যায় চুক্তিতে প্রতিদিনের মজুরি ৭০০ টাকা হয়ে যায় অনেক সময়। (সূত্র: ইশার আলী, আরাজী শেখসুন্দর, সানিয়াজান, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট)

অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে আগের মতোই পুশ ও পুল ফ্যাক্টরগুলো কার্যকর রয়েছে; এখানে তেমন কোনো বড় পরিবর্তন দেখা যায় না। যদিও বাংলাদেশে অতিদারিদ্র্যের হার অনেকটা কমে গেছে, তবুও দারিদ্র্য এখনো অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের একটি কারণ হিসেবে আছে। তবে, শুধুমাত্র বেঁচে থাকার তাগিদে অভিবাসনের প্রবণতা এখন আগের মতো দেখা যায় না। ১৯৭৩ সালের দুর্ভিক্ষের সময় কিছু অভিবাসনের উদাহরণ পাওয়া যায়। কিন্তু আজকের গ্রামীণ সমাজে প্রচণ্ড দারিদ্র্যের কারণে শহরে চলে যাওয়ার প্রবণতা তেমন চোখে পড়ে না। আমাদের তথ্যেও এমন কোনো তথ্য মেলে না যে মানুষ শুধুমাত্র দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যেই অভিবাসন করছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনে নারী অংশগ্রহণ আন্তর্জাতিক অভিবাসনে চেয়ে বেশি। যদিও কিছু নারী ইদানিং বাইরে দেশের বাইরে কাজ করতে যাচ্ছে, তাদের জন্য আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করার অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে। গ্রামের নারীরা শহরে আসছে মূলত রেডিমেইড গার্মেন্টস সেক্টরে আর  গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতে। গার্মেন্টসে বেশির ভাগই নারীশ্রমিক। ফলে তাদের জন্য একটি বিশাল দরজা খুলে গিয়েছে।

আমাদের গবেষণাতথ্য থেকে জানা যায়, অভ্যন্তরীণ অভিবাসীরা দেশের বিভিন্ন স্থানে পাড়ি জমায়, এবং তাদের গন্তব্যও আন্তর্জাতিক অভিবাসনের মতোই বৈচিত্র্যময়। সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে যে কাজগুলো পাওয়া যায়, সেগুলোর ধরনও এখন বিচিত্র। এই পেশাগত বৈচিত্র্য অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

এনতাজ আলী (আরাজি শেখসুন্দর, সানিয়াজান, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট) এর থেকে জানা যায় এখানকার লোকেরা কাজের জন্য ঢাকা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জে যায়। টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জে ধান গারতে (ধান লাগানো) এবং কাটার সময় যায়। টাঙ্গাইলে মাঘ মাসে ধান লাগাতে যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসে সেই ধান কাটতে যায়। “ঢাকায় বছরের বারোমাসই যায়। ঢাকায় কাজের অভাব নাই—রিক্সা চালায়, রডের কাজ, ঢালাইয়ের কাজ করে (যোগালি, মিস্ত্রী হিসেবে), গার্মেন্টসে কাজ করে, গাড়ি চালায়, বগুড়ায় ধান ও সরিষা কাটার জন্য যায়। এই এলাকার মানুষ আগের থেকে অনেকবেশি কাজের জন্য বাইরে যায়। কাজের জন্য বেশি যাওয়ার  কারণ জানতে চাইলে জানায়—সেখানে আয় বেশি, আবার নিজেদের আবাদি জমি নাই, আবাসনে (আশ্রয়প্রকল্পে) থাকে, জমি লিজ নিতে অনেক টাকা লাগে এসব কারণে তারা বাইরে কাজ করতে যেতে বাধ্য হয়।

এছাড়া বিভিন্ন স্থানে খণ্ডকালীন বা মৌসুমি শ্রমিক হিসেবে পেশার কথা আমরা গবেষণায় উলেখ পেয়েছি।

> “এই গ্রাম থেকে কাজের উদ্দেশ্য নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে কাজ করতে যায়। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বগুড়া, ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, টাঙ্গাইল। বগুড়ায় ইটভাটায় কাজ করতে যায়। যারা ইটভাটায় কাজ করতে যায় তারা শীতের শুরুতে গ্রাম থেকে কাজের উদ্দেশ্যে চলে যায়। ইটভাটায় তারা কমপক্ষে ৪ মাসের জন্য যায়। একটানা কাজ করে আবার ফিরে আসে। যায়া ইটের ভাটায় যায় তারা ১২–১৪ বছর হলো যাচ্ছে। ২৫ বছর আগে শুধু ধান কাটার জন্য বগুড়ায় যেত। এছাড়া ঢাকাতে যায় রাজমিস্ত্রীর কাজে বা ইটের ভাটায়। চট্টগ্রাম, সিলেটে যায় পাথর উঠানোর কাজের জন্য আর টাঙ্গাইলে যায় কৃষি কাজের জন্য। (ইউসুফ আলীর ছেলে আসাদুল ইসলাম, আরাজি শেখসুন্দর, সানিয়াজান, হাতিবান্ধা, লালমনিরহাট)

বিভিন্ন পেশা থেকে তারা আয় করছে, এবং এই আয়ের ধরনও একেকজনের জন্য একেক রকম। যেমন, ইটভাটার শ্রমিকদের নতুন অভিবাসনকারী হিসেবে দেখা যাচ্ছে। এরা নিম্নরুজির শ্রমিক।

একদিক থেকে দেখলে আন্তর্জাতিক অভিবাসন অভ্যন্তরীণ অভিবাসনকে প্রভাবিত করছে। রেমিটেন্সের প্রভাবে দেশের অর্থনৈতি সবল হচ্ছে, দেশে নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। ফলে নতুন অভ্যন্তরীণ শ্রমিক তৈরি হচ্ছে। ফসল কাটা এখনও রয়েছে যদিও তার সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছে। কারণ কৃষিতে এখন অনেক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন বগুড়ায় আগে কৃষিকাজ পাওয়া যেতো। একসময় সেখানে অনেক শ্রমিক ফসল কাটার সময় যেতো। কিন্তু এখন লক্ষ্য করা যায় সেসব অঞ্চলে কেবলমাত্র শুধু কৃষিশ্রমিকই না, অন্যান্য পেশার মানুষও অভিবাসন করছে। এই প্রসঙ্গে পদ্যোত সরকার (গোবিন্দকাঠি, দক্ষিণ শ্রীপুর, কালীগঞ্জ, সাতক্ষীরা) বলেন:

> “এই এলাকাতে যখন ধান চাষ হতো তখন আমি গ্রামের বাইরে কাজ করতে যেতাম না। এই গ্রামে ধানের চারা রোপন, ধানকাটা এবং মাটি কাটাসহ হালচাষের কাজ করতাম। যেহেতু আমাদের এই গ্রাম এক ফসলি ধানচাষ হতো। সেজন্য গ্রীষ্মকালে কাজহীন থাকা লাগতো। তারপরেও আমাকে বেশি বাইরে গিয়ে কাজ করতে হত না, কারণ তখন আমি অবিবাহিত ছিলাম, আমার তেমন খরচ ছিল না।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে ঢাকা একটি বড় কেন্দ্র, যেখানে নারীদের অভিবাসনের হার বেশি। তবে ঢাকায় আয়ের সুযোগ অন্য এলাকার চেয়ে বেশি হলেও তা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আয়ের চেয়ে সাধারণত অনেক কম। তবু ঢাকা অভিবাসীদের জীবনযাপনে এর প্রভাব কম নয়। আমরা ঢাকার ২টি এলাকার তথ্য সংগ্রহ করে দেখতে পাচ্ছি, বস্তিবাসী মানুষ পেশার ভিত্তিতে নতুন নতুন নেটওয়ার্ক বা গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলছে। গার্মেন্টস শ্রমিকরাও যেমন বস্তিতে থাকে, তেমনি গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করে তারাও সেখানে থাকে, এবং স্ব স্ব পেশার মানুষের মাঝে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে। উভয়েই অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী। আমরা দেখেছি ঢাকার কুড়িল বস্তিতে বেশিরভাগ মানুষের বাসায় ফ্রিজ, টেলিভিশন রয়েছে। এটি গ্রামের সাধারণ কৃষিজীবীর পক্ষে এসব ক্রয় করা সম্ভব হত না। অতএব তারা স্থায়ীভাবে শহরের দিকে চলে যাচ্ছে।

যারা শহরের দিকে চলে যাচ্ছে এরা অর্থ উপার্জন করে গ্রামে পাঠাচ্ছে এবং গ্রামে জমি ক্রয় করছে। যদিও সেই জমির মান কিছুটা কম বা সেখানে তেমন উন্নত ফসল হয়না কিন্তু তবুও তারা জমি ক্রয় করছে। অন্তত যদি তাদের ভিটাজমি লগ্নির কাছে চলে গিয়ে থাকে তাহলে সেটা ছাড়িয়ে নিচ্ছে। এই কারণে গ্রামের ক্ষেত্রে অভিবাসনের প্রভাব ইতিবাচক ।

অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, অভিবাসীরা নিয়মিত বাড়িতে যোগাযোগ রাখে। অর্থাৎ দীর্ঘ সময়ের জন্য তারা বাড়ি থেকে দূরে থাকে না তেমনটা আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে হয়না।

## ৭. নারী

অভিবাসন যেমন অর্থনীতি, সমাজ, ও রাজনীতি পরিবর্তন করে, তেমন নতুন সম্পর্কের সমীকরণ তৈরি করে। গবেষণায় নারী এবং পুরুষ উভয় অভিবাসী দেখা যায়। তবে নারীদেরকে দুর্বল এবং দুর্দশাগ্রস্থ অভিবাসী জনগোষ্ঠীর অংশ হিসেবে দেখা হয়। পুরুষকে দেখা হয় সবচাইতে বেশি অভিবাসী এবং প্রভাবিত জনগোষ্ঠী হিসেবে। তবে সংখ্যার দিক থেকে তারা কম হলেও তাদের প্রভাব সেই তুলনায় অনেক বেশি। অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের প্রভাব গ্রামীণ জীবনে তুলনামূলকভাবে কম পড়লেও নারী যখন অভিবাসন করে তখনই তার পরিবার, গোষ্ঠী, সমাজসহ সকল ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে। এর কারণ হল, গ্রামীণ সমাজে পুরুষরা সবসময়ই ঘরের বাইরে কাজ করেছে, বেশির ভাগ নারীর স্থান ছিল ঘরে, যেই পারিবারিক গণ্ডি থেকে অভিবাসী নারীরা সম্পূর্ণরূপে নতুন একটি পরিসরে চলে যায়; যার ফলে সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে নয়া একটি বাস্তবতা তৈরি হয়।

স্থানীয় অভিবাসীদের ক্ষেত্রে তারা তাদের পরিচিতজনদের মাধ্যমে তাদের নেটওয়ার্ক খুব দ্রুত স্থাপন করতে পারে। বস্তুতপক্ষে, আমাদের মাঠ পর্যায়ের তথ্য থেকে জানা যায় যে, যারা কাজ করতে যাচ্ছে তারা একটি নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যাচ্ছে। অতএব বিচ্ছিন্ন এক গ্রাম, যেখান থেকে কিছু না জেনে একজন নারী শহরে চলে যাচ্ছে এরকম অবস্থা কখনোই হয়না। আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি দেখা যায়। কারণ এই অভিবাসনে তারা প্রায় একই নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রে নারী অভিবাসীদের যাওয়ার সুবিধা হয় কারণ বিশেষ কিছু দেশে নারীদের প্রয়োজন বেশি হয়। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে গৃহকর্মী হিসেবে নারীদের নিয়োগ দেওয়া হয়। সেই কারণে এসব দেশে নারীরা অনেক সস্তায় যেতে পারছে।

আমরা বিধুভূষণ দাশকে (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) জিজ্ঞেস করি নারীদের অভিবাসনে কেমন পরিবর্তন দেখেন? উত্তরে তিনি আমাদের বলেন: "বিদেশ যাওয়া নারীর সংখ্যা বেশি। নারীদের বিদেশ যেতে খরচ কম লাগে। নারীর বেলায় যে ভিসা আসে তাতে সব খরচ ওই দেশের মালিক পাঠায়। পুরুষের বিদেশ যেতে যতদিন ঘোরা লাগে, নারীদের তত দিন লাগে না। মহিলাদের দিনও কম লাগে, আবার টাকাও কম লাগে।"

একই প্রসঙ্গে আকলিমা বেগমকে (কাশিপুর, আটগাও, শালা, সুনামগঞ্জ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন: "আগে মহিলারা যাইতো না। এখন ৫–৬ বছর যাবৎ মহিলারা যায়। মহিলারার বিদেশ যাইতে টাকা লাগে না। যাওয়ার পর যাদের লোক ভালো পরে তারা থাকতে পারে। আর যাদের লোক ভালো পরে না তারা থাকতে পারে না।"

গ্রামে মেয়েরা সাধারণত বিয়ের আগে অভিবাসন করে। অনেকক্ষেত্রে বিবাহিত মেয়েরাও চলে যায় এবং স্বামী রয়ে যায়। তবে এর সংখ্যা কম। যেহেতু বাড়িতে মা রয়েছে তাই বাচ্চারাও অনেক সময় থেকে যায়। আমরা বস্তিতে জরিপ চালিয়ে দেখেছি সবাই পরিবারভিত্তিক নয়। তবে প্রায় ৯০ ভাগ বস্তিবাসী পরিবারভিত্তিক। অতএব পরিবারভিত্তিক অভিবাসন আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে দেখা না গেলেও অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে লক্ষণীয়।

কুড়িল বস্তির ২৫ জন বাসিন্দাদের ওপর জরিপ থেকে দেখা যায় পরিবারিক অভিবাসন ছাড়াও অনেকক্ষেত্রে নারীশ্রমিক ঢাকায় আসে ও নিয়মিত গ্রামে টাকা পাঠায়। তার ফলে তার নিজের পরিবারের কোনো বাধা আসে

না, কোনো প্রশ্নের সামনে পড়তে হয় না। বিশেষ করে তার বাবা-মা বাধা দেয় না। তবে বিবাহিত নারীরা অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে স্বামীকে দেশে রেখে আসে না। অনেকক্ষেত্রেই বিবাহ হয় পারিবারিকভাবে ঢাকায়। কর্মী মেয়েদের বাল্যবিবাহের উদাহরণ নেই।

সামগ্রিকভাবে, নারী শ্রমিকদের অভিবাসনের সংখ্যা দেখে বোঝা যায় গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি মৌলিক পরিবর্তন এসেছে। তারা শহর থেকে গ্রামে অর্থ পাঠাচ্ছে; যার ফলে গ্রামীণ এলাকায় আর্থিকপ্রবাহ বেড়েছে এবং এতে একটি সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। এর ফলে পরিবারের অর্থনৈতিক কল্যাণ হচ্ছে। এই কারণে পরিবারও তাকে সমাজ থেকে রক্ষা করছে। এছাড়া বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে দেখা যায় ১৮ বছরের নিচের শিশু যদি আয় করে তাহলে পরিবার তাকে নিরাপত্তা দেয়, বিয়ে দেয়না। এভাবে আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে যেই মুহূর্তে একজন নারী স্বাবলম্বী হয়ে উঠে তার অবস্থান পাল্টে যায়।

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে গ্রামে নারীরা নতুন এক আর্থ-সামাজিক উপকরণ হিসেবে উপস্থিত হচ্ছে। কিছু কিছু সাক্ষাৎকারে লক্ষ্য করা যায় পাড়াপ্রতিবেশি তাদের সমালোচনা করছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও প্রতিটি গ্রামেই নারীদের অভিবাসন চলছে।

তবে লক্ষ্য করা যায় আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে যে অর্থনৈতিক সুবিধা তারা নিয়ে আসে সেটা অনেক বেশি থাকে। এই কারণে অভিবাসী নারীকে মেনে নেওয়া বা গ্রহণ করার বিষয় অনেক বেশি লক্ষণীয়।

“যে ইনকাম করে পরিবারে তার প্রাধান্য থাকে। টাকার জন্য হলেও তার কথা শুনে।” (আকলিমা বেগম, কাশিপুর, আটগাও, শাল্লা, সুনামগঞ্জ)

এছাড়া, নারীদের শিক্ষা, ইনকাম আর বাইরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে কেমন পরিবর্তন হয়েছে জিজ্ঞেস করলে খন্দকার বাড়ির ইয়াসিনের পরিবার (ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা) বলেন: “বাসার বাইরে মেয়েরা এখন গার্মেন্টসমুখী হইয়া গেছে। গ্রামে ২০১০–২০১৫ সালের পরে থেইকা নিম্নশ্রেণির মেয়েরা সবই এখন চইলা গেছে গার্মেন্টসে। মেয়েরা এখন কামাইনা শিখছে। মনে করো আমার বাড়ি থেইকা আমি গেছি, গিয়া আমি ১০ হাজার টাকা বেতন পাই, আমি আরেকজনরে কইছি আমিতো ১০ হাজার টাকা পাই, তুই করবিনি? তহন কয়—হ্যাঁ, অসুবিধা কী? করমু।”

রেডিমেইড গার্মেন্টসের শ্রমিকরা একটি নতুন উপশ্রেণি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের রাজনীতি তৈরি হয়েছে। এর ফলে এটি তাদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয় হিসেবে থাকে না। তারা নগরের জীবনের সাথে পরিচিত হয়ে নাগরিক হয়ে উঠছে এবং নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। নারী শ্রমিক যারা রেডিমেইড গার্মেন্টসে কাজ করে তারা নিজেদের মধ্যে জোট বেঁধে থাকে। কারণ অনেকসময় তাদের নিজেদের জীবনে যেসব ঝামেলা পোহাতে হয় সেটি তারা অন্যদের সাহায্য না পেলে সমাধান করতে পারে না।

তবে নারী শ্রমিকদের একটি বড় সমস্যা হল কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, যদিও দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন সংস্থা যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিয়েছে। তবে আমাদের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু নারীশ্রমিক রুজির ক্ষেত্রে কিছু কিছু পর্যায়ে যৌন হয়রানি সহ্য করতে রাজি আছে। যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যৌন হয়রানি প্রতিরোধে তারা কাদের থেকে মুক্তি চায়? তখন তারা পুরুষ শ্রমিকদের কথা বলছে।

গার্মেন্টস শ্রমিক ও অভিবাসনের প্রভাব নিয়ে ২০২২ সালে Action Aid-এর একটি একটি অবস্থানমূলক প্রতিবেদন[১] তৈরি করা হয়, নারীদের কর্মস্থলে হয়রানি ঠেকাতে কী করা যায় সেই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। সেখানে দেখা যায় যে, যৌন হয়রানি সাধারণত তাদের সহশ্রমিকদের থেকে কম হয়। প্রধান হয়রানি আসে ঊর্ধ্বতন সুপারভাইজারদের কাছ থেকে। এছাড়া, শ্রমিকদের মধ্যে এক ধরনের ঐক্য কাজে করে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীদের প্রতি পুরুষ শ্রমিকদের সহায়তার একাধিক উদাহরণ পাওয়া যায়। অতএব দেখা যায়, নারী ও পুরুষ শ্রমিক সাধারণভাবে একসঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত।

যৌন হয়রানির অভ্যন্তরীণ অভিবাসন এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসনকে আলাদা করে দেখা যেতে পারে। এর কারণ আন্তর্জাতিক অভিবাসনের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থা বেশি নাজুক, কারণ তারা পরিবার ও সমাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবাসী নারীর ওপর নির্যাতন, বিশেষত যৌন নির্যাতনের তথ্য গণমাধ্যমে উঠে আসছে। তাই গত কয়েকবছরে নারী অভিবাসীদের মধ্যে কিছুটা হলেও সচেতনতা বাড়ছে।

নারীদের আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হলো দক্ষতার অভাব। অভিবাসীরা কোনো নতুন দক্ষতা অর্জন করছে না। যে গার্মেন্টস শ্রমিক হিসেবে কাজে ঢুকেছে সে একই পদে রয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ভবিষ্যতে তার বিপদগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরেকটি বিষয় হলো—গ্রামে সে যেই টাকা পাঠাচ্ছে সেটার ওপর কিছুক্ষেত্রে তার নিয়ন্ত্রণ থাকছে না। বিশেষত যদি অভিবাসীর স্বামী দেশে থাকে, সে সেই অর্থ নিয়ন্ত্রণ করে। নারী অভিবাসীরা নিজের উপার্জিত টাকা নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে এখনো রয়েছে বাধা।

সামাজিক কাঠামোতে নারীশ্রমিকরা কিছুটা নিগৃহীত। তাদের যৌনচরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তবে ক্রমেই এই প্রশ্নগুলো দুর্বল হয়ে উঠছে। যেহেতু তারা উপার্জনকারী, তাদের প্রতি পরিবারের নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হচ্ছে এবং এর ফলে তারা এক ধরনের স্বাধীনতা ভোগ করছে। গ্রামের মানুষ এখন বুঝতে পারছে এই নারী এখন গ্রামের উপরে অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল নয়। অতএব সে সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য কোথাও চলেও যেতে পারে। ফলে এখানে একটি সমঝোতা তৈরি হচ্ছে যেখানে নারীশ্রমিকের গ্রহণযোগ্যতা এবং অভিবাসন বাড়ছে।

আমরা অভ্যন্তরীণ তথ্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে জানতে পেরেছি যে, অনেকক্ষেত্রে যৌনজীবন গ্রহণযোগ্য নয় সামাজিকভাবে। কিন্তু সেই সম্পর্কে কেউ আলাপ-আলোচনা করছে না, গোপনীয়তা রক্ষা করছে। জানাজানি হয়ে গেলে সেটা অন্য বিষয়। তবে এটি ব্যতিত অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের কারণে পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এমন কোনো উলেখ নেই। এর ফলে পরিবারকে সংরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে তখন পুরুষ এবং নারী উভয়ই সমানভাবে কাজ করে।

তবে একক ধারণা নিয়ে বাংলাদেশের গ্রামের অবস্থানকে দেখা যায় না। অনেকক্ষেত্রে তারা মনে করে নারীরা বাহিরে গেলে খারাপ হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে।

> “যখন অভিবাসী নারীরা ফেরত আসে কিংবা এক বাসার সাথে আরেক বাসায় ঝগড়া লাগে তখন গ্রামের মানুষ তাদের খোঁচা দেয়। সারাবছর ঢাকায় গার্মেন্টসে খেটে আসলে আর এখন এসে ফুটানি! দিনমজুরির কাজে যেমন কাঠমিস্ত্রি বা রাজমিস্ত্রির চাইতে সম্মান কম, তেমনি যারা গার্মেন্টসে যায় তাদের সম্মানটাও কম গ্রামের মানুষের কাছে। যখন ঝগড়া লাগে তখন মানুষের টাকা পয়সা চাইতে চরিত্র নিয়ে বেশি কথা বলে বিশেষ করে যারা গার্মেন্টসে থাকে তাদের চরিত্র নিয়ে বলে। (এনাজুল, রামপুরা, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর)

[1] Workplace harassment: Situation report and Strategies for action: Afsan Chowdhury and Arjuman Naziz (Jahangirnagar University) 2022. Commissioned by Action Aid, And ILO

গবেষণা সাক্ষাৎকারে মানুষ বলছে, নারীরা আলাদা আলাদা চিন্তাভাবনা নিয়ে এসে গ্রামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন করে দিতে পারে। সেজন্য তারা দুশ্চিন্তা করে। সনাতনী ভাবধারার মানুষ বা যারা গ্রামের প্রথা ভাঙ্গতে দিতে চায় না তাদের মধ্যে এই দুর্ভাবনা অনেকবেশি। কিন্তু পারিবারিকভাবে সেই দুর্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে যে, পুরুষ অভিবাসীদের পরিবারের থেকে যাওয়া নারীসদস্য অনেক সময় সামাজিক সমস্যায় পতিত। কিন্তু যে নারী অভিবাসন করে এবং সে যদি ফেরত আসে তার সামাজিক সমস্যা তেমন হয়না। তবে অনেকেই উলেখ করছে যে বিভিন্ন সমস্যা হয়। সে নতুন জীবনযাপন করে, সে নতুন কাপড়চোপড় পরে, সে কথা শুনতে চায় না ইত্যাদি। এই পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসন উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

তথ্যদাতা আব্দুর রশিদ (রামপুরা, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর) বলেন:

> “ গ্রাম থেকে কেউ গিয়ে যদি ভালো কিছু করে তাহলে গ্রামের সবাই ভালোভাবে দেখে। তবে যখন কেউ গ্রাম থেকে গিয়ে ঢাকা শহরে থাকে তখন ঢাকা শহরে যেভাবে চলাফেরা করে সেটা তাদের মধ্যে ঢুকে যায়। তারপর তারা যখন গ্রামে আসে তাদের কাপড়-চোপড়, চলাফেরা সেরকম থেকে যায় এইটা গ্রামের অনেকেই মেনে নিতে পারে না। আগে যেমন গ্রামের মধ্যে কোনো মেয়ে চলাফেরা করলে হাত পা ঢেকে বের হত যাতে কোনো ছেলে কোনোকিছু দেখে টিটকারি মারতে না পারে। কিন্তু এখন যখন শহরে বা কোথাও চাকরি করছে, এরপর যখন গ্রামে আসে তখন তাদেরকে দেখে মনে হয় না যে তারা এই গ্রামের মানুষজন। তারা সেখানে যেভাবে চলাফেরা করে অভ্যস্ত হয়েছে গ্রামে এসেও সেভাবে চলাফেরা করতে চায় সেটা গ্রামের মানুষদের পছন্দ হয় না।

কিছুক্ষেত্রে অভিবাসনের ফলে পারিবারিক জটিলতা দেখা দেয়, বিশেষ করে যখন মায়েরা সন্তানদের রেখে শহরে চলে যায়। তখন শিশুদের দায়িত্ব দাদা-দাদী বা নানা-নানীর উপর পড়ে, কিন্তু সব পরিবারে এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন হয় না। ফলে পরের প্রজন্ম শিক্ষিত হয়ে নতুন পেশায় যেতে পারছে এমন উলেখ পাওয়া যাচ্ছে না।

আবার, পরিবারের পুরুষ সদস্যরা যখন বাইরে যায় তখন পরিবারের নারীদের ভূমিকায় কী ধরনের পরিবর্তন আসে—এপ্রসঙ্গে জানতে চাইলে এনাজুল (রামপুরা, দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর) বলেন: “যখন পরিবার থেকে পুরুষরা বাইরে যায় তখন যদি সেই পরিবারে কোন বাচ্চা ছেলে থাকে বা কোন ছেলে থাকে সে মোটামুটি দায়িত্ব পালন করে। নারীরা ওইসময় পরিবারের প্রধানের ভূমিকা পালন করে বাকিটুকু ওই বাচ্চা ছেলে সহযোগিতা করে। তবে যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তখন আবার পুরুষের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তবে বাসায় যদি কোন ছেলে না থাকে তাহলে সম্পূর্ণ দায়িত্বই নারীকে পালন করতে হয়। বাইরে থেকে যদি টাকা পাঠায় তাহলে বাজারে গিয়ে সেই টাকা তুলে আনা, বাড়ির বাজার করা, বাড়ির সবকিছু দেখাশোনা করা সব দায়িত্ব থাকে ওই নারীর উপরে। বাড়িতে যদি ৫টা কামলা নেয় তাহলে সেটা দেখাশোনাও তাকে করতে হয়।”

মূলত গ্রামে সংসার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব হল নারীর, যেটা এখনও চালু রয়েছে। এই রক্ষণাবেক্ষণ কাঠামোর ওপর তেমন প্রভাব পড়ে না পুরুষ বাড়ি ছেড়ে গেলে, কারণ তারা সনাতনীভাবে এই রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকে না। সে বাড়ির প্রধান হতে পারে কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণ বা বাড়ির দেখাশোনা (house management) নারীর মূল দায়িত্ব। এই কারণে নারীর অভিবাসন একটি পরিবারের উপরে বেশি প্রভাব ফেলে। পুরুষের সাথে অভিবাসনের সম্পর্ক অধিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক। কিন্তু নারীর সাথে অভিবাসনে অর্থনৈতিক অবস্থার

পাশাপাশি সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়ের সম্পর্ক বেশি গভীর। তাই তাদের অভিবাসনের বহুমাত্রিক দিক বেশি। নয়াবাস্তবতার ফলে সনাতনী পারিবারিক সাংস্কৃতিতে মৌলিক পরিবর্তন আসে।

এত বাধাবিপত্তি থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই নারীরা অভিবাসন করতে পারছে। আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসন দুটোর ক্ষেত্রেই নারী উপকার পাচ্ছে, অর্থনৈতিকভাবে সবল হচ্ছে, সমাজে ধাক্কা লাগছে এবং সমাজ সেটা সামলাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু যেহেতু অভিবাসন বড় একটি বাস্তবতা সেই কারণে বিভিন্ন পর্যায়ে, বিভিন্ন অবস্থায় তারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু বাধার কারণে নারী অভিবাসন কমে যাচ্ছে এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়না। অভ্যন্তরীণ অভিবাসন করে দরিদ্র মানুষ এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন করে তুলনামূলকভাবে অবস্থাপন্ন মানুষ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণি। যদিও মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপর ধর্মে প্রভাব অনেক বেশি সেই কারণে তারা এই অর্থনৈতিক প্রভাব মেনে নিচ্ছে। অতএব আমরা বলতে পারি, নারীর অভিবাসনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত অর্থনৈতিক চাহিদার উপর নির্ভর করছে।

> “আগে চলতাম ভালোই। এরপর আমার এক নাতির হইল অসুখ। কোনো কুল-কিনারা পাই না। এরপর লইয়া গেল দিরাই। হেইখান থাইকা ডাক্তাররা সিলেটে পাঠাইলো। হাতে পয়সা নাই। সিলেটে ১ মাস, এইখানে ৬–৭ দিন এইভাবে কতগুলা টাকা গেলো। এরপর আমরার বাড়িও গেল বানে ভাইঙ্গা। ৪–৫ টা গরু, গরুর খাওন নাই। খ্যাড় (খড়) কিনলাম। এর থেকে টাকা আনি, ওর থেকে টাকা আনি। পইড়া গেলাম বিপদে। যেসময় নাতিরে লইয়া পুতে সিলেট গেল সেসময় মাছ মারুন যায়। সময়ডাই মাছ মারার। তো মাছ ধরতে পারলাম না সেই সময়। বাড়ি যেহেতু ভাইঙ্গা গেল ঐ হাটির ধনী কৃষক রিয়াজ আমরার আত্মীয়, তার বাড়িত জায়গা দিল। গরু বেইচা দিলাম। বাড়ি ভাইঙ্গা গেলে মানুষের বাড়িত মানুষ লইয়া যাওয়া যায় গরু বাছুড় লইয়া কি যাওয়া যায়? এরপর মাটি আনলাম ঘর ঠিক করলাম। এমনে ১ টাকা আনি আর ৩ টাকা বাইর অইয়া যায়। তখন বেডা-বেডি, মানে আমার পুত আর পুতের বউ মিইল্যা বুদ্ধি করলো বিদেশ যাওয়ার। কইলো আমরা যদি হেরার (তাদের) বাচ্চাকাচ্চা রাখি তাইলে বৌমা বিদেশ যাইব। তখন বউয়ের বাপ মা না করছে। তারা কইছে তোরে আমরা পালমু বিদেশ যাওনের কাম নাই। তখন আমরার বৌমা তার বাপ মারে কইছে আমার ২ লাখ টাকা দেনা, তা কি তোমরা দিবা? সংসার আমার চিন্তাও আমার—এই বইলা আমার বউমা বিদেশ যায়।” (তাহারউদ্দীন, পশ্চিম কাশিপুর, শাল্লা, সুনামগঞ্জ)

## ৮. আলোচনা: অর্থনৈতিক উন্নতির “মূল্য” প্রদান

গ্রামীণ পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পরিসর

এই গবেষণার মূল বিষয় হলো পরিবর্তন। আর গ্রামীণসমাজে অভিবাসন যে সবচেয়ে প্রভাবশালী রূপান্তরকারী উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। সাধারণভাবে মনে করা হয় অভিবাসন শুধু অর্থনৈতিক উন্নতি বয়ে আনে। অভিবাসন একটি মৌলিক প্রক্রিয়া যা সমাজের সকল প্রতিষ্ঠানে ক্ষয়, রূপান্তর, বা বিচ্যুতিও ঘটাচ্ছে। অভিবাসনের অনেক প্রভাব আগের সমাজের মূলভাবনা ও ব্যবহার বা আদান-প্রদান ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিচ্ছে, ফলে এগুলো নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। তবে আজকের দিনে বাংলাদেশের গ্রামে অভিবাসন মানুষের অন্যতম প্রধান রুজির উৎস, তাই এর বিভিন্ন সামাজিক প্রভাব পছন্দ না হলেও অভিবাসন ঘটবে। তিনটি পরিসরে কী, কত এবং কেন “দাম” চুকাতে হচ্ছে এটিই এই পরিচ্ছদের প্রধান বিষয়। আবারো মনে রাখতে হবে, বিষয়গুলো নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করা হয়েছে, ভালমন্দ বিচার করা হয়নি।

## ৮.১ পারিবারিক পরিমন্ডল

অভিবাসনের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়ে পরিবারের ওপর যেটা সকল তথ্য থেকেই পাওয়া গেছে। বেশিরভাগক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক উন্নতি আনে, পারিবারিক সকলক্ষেত্রেও ভিন্নমাত্রা আনে। এর সরাসরি প্রভাব পড়ে পরিবারের গঠনে। সনাতনী পরিবার বলতে যা বোঝায় তা আর থাকছে না।

### পরিবারে নারীর ক্ষমতায়নের পাশাপাশি শিশু ও বৃদ্ধ সদস্যদের নাজুকতা বৃদ্ধি

বাবা এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে মা যখন দেশের বাইরে চলে যায় দীর্ঘদিনের জন্য তখন তার নেতিবাচক প্রভাবে সবচেয়ে বেশি পড়ে সন্তানদের ওপর।

খুলনার একজন তথ্যদাতা জানায়, তার বাবা কবে বিদেশ গেছে তারা জানে না। জন্মের পর থেকেই তারা তাকে কাছে পায়নি। তার মা আর মামারা সব সামলেছে। চাচারাও প্রবাসে থাকার ফলে তার বাবার দিকের পরিবারের সাথে তেমন ঘনিষ্ঠতা নেই, কারণ টাকা আসে মার কাছে, সেই সব ঠিক করে। তবে তার স্কুলের বন্ধুদের জীবনে বাবা আছে, তাদের বাবাই তাদের সব দেখা শোনা করে। তাদের বাসায় গেলে নিজেকে আলাদা মনে হয়। তাদের জীবনে কিছু যেন নেই সেরকম অনুভূতি হয়। সে জানে তার বাবা বিদেশে টাকা কামাচ্ছে তাদের জন্য, তারা সচ্ছলতা আছে, তবুও সে তার বাবার অভাব অনুভব করে।

সন্তানদের অভিবাসন একটি বড় দুশ্চিন্তার বিষয় বয়স্কদের কাছে কারণ অনেকেই পুত্র সন্তানের ওপর নির্ভরশীল থাকে বৃদ্ধকালে। সেটি কেবল আর্থিক নয়, সামাজিক ও অন্যক্ষেত্রেও। অসুস্থ হলে দেখাশোনার ব্যাপারটা বড় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ছেলে বিদেশে চলে গেলে তাদের দেখাশোনার লোক কমে যায় বা থাকেই না। এক পুত্র সন্তান বিদেশে গেলে অন্য ছেলেদের যাবার সম্ভাবনা বেশি থাকে। অতএব অভিবাসনের কারণে বৃদ্ধ মানুষেরা নানারকম নাজুকতার সম্মুখীন হন।

অর্থনৈতিক পরিসরে অনেকক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন দেখা যায় অভিবাসীর বিয়ের আগে ও পরে। বিয়ের আগে তারা টাকা পাঠায় বাবা-মার কাছে। আর সেই কারণে তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি থাকে পরিবারে। কিন্তু বিয়ের পর টাকা আসে স্ত্রীর কাছে এবং এর ফলে পারিবারিক পর্যায়ে ক্ষমতার মেরু পাল্টে যায়। নারীর ক্ষমতায়ন হচ্ছে এই নয়া সমীকরণে কারণ অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত অনেকক্ষেত্রে স্ত্রীর। অন্যদিকে অভিবাসীর বাবা-মা অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়ে পুত্রবধূর ওপরে, যা তাদের নাজুকতা বৃদ্ধি করে এবং পারিবারিক ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। অন্ত-প্রজন্মিক যে পরিবারপ্রথা এতদিন চালু ছিল তা প্রবল চাপের মধ্যে আছে এসব কারণে।

### দাম্পত্য জটিলতা

স্বামী বা স্ত্রী দীর্ঘদিন আলাদা থাকার ফলে দূরত্ব সৃষ্টি হয় ও দাম্পত্যসম্পর্ক জটিলতায় পতিত হয়। অভিবাসনের ফলে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য আসায় টাকা পয়সা নিয়ে দ্বন্দ্ব কমে গেলেও অনেকক্ষেত্রে বিচ্ছেদ বা পরকীয়ার ঘটনা ঘটছে। পূর্বেকার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির গবেষণাতেও এটি উঠে এসেছে। কমবয়সী অভিবাসীর ক্ষেত্রে এটি বেশি দেখা যায়।

মাঠকর্মে ভিত্তিতে বলা যায় দীর্ঘদিন আলাদা থাকার পাশাপাশি স্ত্রীর হাতে অর্থ থাকার ফলে তারা অনেকসময় বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে যায়। তবে সালিশের মাধ্যমে “সমাধানের” উলেখ পাওয়া হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে। বিশেষ করে সন্তান থাকলে বিচ্ছেদের ব্যাপারে অনীহা থাকে সবার।

এনজিওকর্মী স্বপন বিশ্বাস জানান: "এটা নতুন কিছু নয় আর। তবে আগে এতো ছিল না, এখন আছে। আমার মতে, তিনটির মধ্যে একটি বিবাহে ঝামেলা আছে। অভিবাসীরা দেশে ফিরে পয়সার জোরে তরুণী সুন্দরী মেয়েকে বিয়ে করে, যার হয়তো আগে সম্পর্ক ছিল। তার কিছুদিন পর জামাই চলে যায় কয়েক বছরের জন্য। আজকালের মোবাইল ফোনের দুনিয়ায় অন্যদের সাথে যোগাযোগ হয়, মাঝে মধ্যে সম্পর্কে গড়ায়, ঝামেলা হয়।"

অভিবাসনের কারণে একসাথে না থাকা ফলে পারিবারিক সম্পর্ক দুর্বল হওয়াটা স্বাভাবিক। পরিবারের সবার ওপরেই চাপ পড়ছে—সেটা, স্ত্রী, বাবা-মা বা সন্তান যেই হোক। তবে এই বাস্তবতা অপছন্দ হলেও, ক্ষতি হলেও সবাই মেনে নিয়েছে। পারিবারিক দুর্যোগ এড়াতে অভিবাসন বন্ধ করেছে এমন তথ্য পাওয়া যায়নি। সবকিছু জেনেই মানুষ যাচ্ছে বাইরে বা শহরে। অর্থনৈতিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করছে সামাজিক ব্যবহার ও গঠন কাঠামো।

**ভবানীপুরের কেস স্টাডি: উচ্চমাত্রার অভিবাসন ও সামাজিক পরির্তন**

সামাজিক পরিসরে পরিবর্তনের একটি বড় কারণ হচ্ছে অভিবাসন। ভবানীপুরের ৭০–৮০% মানুষ কাজের সূত্রে দেশের বাইরে থাকেন। সেই গ্রামে নিম্নোক্ত সামাজিক পরিবর্তনগুলো লক্ষণীয়:

- গ্রামের পেশা হিসেবে সর্ববৃহৎ হচ্ছে অভিবাসন।
- গ্রামের প্রধান বিষয় পূর্বে ছিল জমির মালিকানা, যার মালিক ছিল কম। এখন অনেকের হাতে পয়সা অতএব আগের গ্রামের যে কাঠামো ছিল তা আর নেই। জমি নয় বিত্ত মূল বিষয়।
- নতুন নতুন পেশা তৈরি হচ্ছে, যেমন অভিবাসন দালাল ও এই পেশার সাথে জড়িত। এরা প্রভাবশালী কারণ কীভাবে কই যেতে হবে তা তারা জানে। আগে সমাজে মুরুব্বিদের দাম দেয়া হত, গ্রামে দরবার ছিল যেটা সবাই মানতো। কিন্তু এখন দরবারে নতুন লোক আসছে যাদের পয়সা আছে। দরবারের দাম আগের তুলনায় কম।
- গ্রামের আগে যে নেটওয়ার্ক ছিল সেটা ছিল একটাই কিন্তু এখন একাধিক নেটওয়ার্কে সমাজ চলে। অভিবাসীদের নিজেদের নেটওয়ার্ক হয়েছে।
- আজকাল মেয়েরা অনেক বেশি প্রসাধনী ব্যবহার করে, একই সাথে হিজাব, বোরখা পরে। নিজের মতো চলে।
- কিছু পরিবার যেমন "আধুনিক" হয়েছে চলাফেরায়, ঠিক তেমনি কিছু পরিবার আছে যারা অনেক ধর্মীয়ভাবে রক্ষণশীল, এমনকি টিভিও দেখে না।
- বাজারে নানা রকম খাবার পাওয়া যায়, যেমন বার্গার ইত্যাদি। তরুণরা এই খাবারের প্রতি আকৃষ্ট এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে সেসব অনেক জনপ্রিয়।

## ৮.২. ক্ষমতা ও বিত্ত

যে গ্রামের বড় সংখ্যক মানুষ নির্দিষ্ট পেশায় জড়িতে, বিশেষত যেখানে আয় বেশি স্বাভাবিকভাবে সেই পেশার মানুষেরাই সেখানে প্রাধান্য পায়। আধুনিক বা নতুন সামাজিক ব্যবস্থা সনাতনী ব্যবস্থার তুলনায় অনেক

বেশি প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। তবে এ কথাও সত্য যে, পূর্বের প্রভাবশালীরা এখনো তাদের অবস্থান ধরে রেখেছে, কারণ তারাও বিদেশে যাওয়া ও প্রবাস-অর্থনীতির অংশীদার। এইখানে গ্রামীণ সমাজকাঠামোর একটি প্রতিষ্ঠান "দরবার"—এটিকে কেন্দ্র করে আলাপে অনেক তথ্য উঠে এসেছে।

পূর্বে সবাই দরবার মানতো এবং সদস্যরা ছিল জমির পরিমাণের ভিত্তিতে নির্বাচিত কিন্তু এখন সেটা আর নাই। সবার মতে পয়সাওয়ালা মানুষ গ্রামে প্রধান। এর কারণ সূচক পাল্টে গেছে জাতীয়ভাবে। অতএব সবক্ষেত্রেই তারা প্রভাবশালী। এটি বেশকিছু মানুষের মনে পীড়ার কারণ। তবে এই পরিবর্তনের পেছনে শুধু অভিবাসন নয়, রয়েছে সামগ্রিক সামাজিক রূপান্তর।

একই সঙ্গে ঘটেছে আরেকটি বড় পরিবর্তন। একসময় "দরবার" ছিল গ্রামীণ সমাজের একমাত্র কর্তৃত্বশীল প্রতিষ্ঠান, কিন্তু এখন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে ইউনিয়ন পরিষদ যার ভিত্তি রাষ্ট্রীয়, সামাজিক নয়। বর্তমানে এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনটি বেশি প্রভাবশালী, তা নিয়ে চলছে বিতর্ক। যদিও ইউনিয়ন পরিষদের ক্ষমতাই অধিক বলে প্রতীয়মান, তবে আগের সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও এর সাথে যুক্ত রয়েছেন। এই রূপান্তর আসলে একটি প্রাচীন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বকে খর্ব করেছে; এর পেছনে মূল কারণ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার বিস্তার, অভিবাসন নয়। (সূত্রঃ মোশাররফ মজুমদার কবির, ভবানীপুর, বরুড়া, কুমিল্লা)

এ প্রসঙ্গে ভবানীপুরের আব্দুল হকের পরিবার (বড়ুরা, কুমিল্লা) বলেন: "এহন আর দরবার আছে নাকি? জায়গা-জমি নিয়া কোনো ব্যাড়াছ্যাড়া নাই। ৫–১০ বছর হইবো জায়গা-জমি নিয়া ব্যাড়াছ্যাড়া নাই। এর আগে দরবার হইতো এসব নিয়া, বউরে নিয়া, ঝি নিয়া ব্যাড়াছ্যাড়া লাগলে হইতো। এহনের চ্যানেলে যারা কয় হেগো কথা হুনে না, সবাই নিজেরে নিজে বড় জানে। আগের মুরুব্বিরা কথা কইলে আবার হুনে এহনো।"

আবার ভবানীপুরের কবির বাবুর্চি (ভবানীপুর, বড়ুরা, কুমিল্লা) বলেন: "দরবারে আগে যেমন ইজ্জত সম্মান ছিলো, এখন এইটা নাই। আগে গ্রামের ১০ জন মিলে সালিশবোর্ড বানায়ে একটা সিদ্ধান্ত দিয়ে যেকোনো সমস্যার সমাধান হয়ে যাইতো। মানুষও মানতো, ন্যায় হোক, অন্যায় হোক মুরব্বিরা বলছে যেহেতু, তাহলে এইটাই। এরকম একটা ইজ্জত দিতো আগের মানুষ, আর দরবারেও কোনো দুইনম্বরি বিচার হইতো না যার জন্যে মানুষের আস্থা কমে যাবে। এখন আর এইটা নাই। আপনি মনে করেন অন্যায় করছেন কিন্তু পার্টির ক্ষমতার কারণে দেখা যায় কিছু বলা যায় না। দরবার মানে না এখন, গ্রামে এখন পার্টির ক্ষমতা ঢুকে গেছে।"

## ৮.৩. রাষ্ট্র ও ডিজিটাল ক্রিয়া প্রক্রিয়া

আজকাল বিভিন্ন কাগজপত্র শনাক্তকরণ ও সত্যায়িতকরণের প্রয়োজন হয়, যার সাথে জড়িত ডিজিটাল পদ্ধতির ব্যবহার। যেহেতু অভিবাসীদের বিভিন্ন কাগজ লাগে, তাই তাদের সরকারি অফিসের সাথে যোগাযোগ করতে হয় এবং এই অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। তাই গোটা প্রক্রিয়া তারা অপছন্দ করে। এতে তারা মনে করে, আগের দরবার অনেক মানবিক ছিল, সহজে কাছে যাওয়া যেত।

যদিও মানুষ এসব পরিবর্তনকে অভিবাসনের ফল হিসেবে দেখছে, আসলে এগুলো রাষ্ট্রীয় ও সামগ্রিক পরিবর্তনের অংশ। কৃষিঅর্থনীতির কালে যে প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর রূপ পরিবর্তিত হচ্ছে—হোক তা দুবাইয়ের প্রবাসী কাজ, ঢাকার গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, কিংবা গৃহস্থালির কাজে অভিবাসন। একই সঙ্গে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকার এখন অনেক বেশি সক্রিয়, যা আগের প্রতিষ্ঠিত কাঠামোগুলোকে পুরোপুরি না ভাঙলেও কিছুটা দুর্বল করে দিচ্ছে। এই পরিবর্তনের পেছনে একাধিক শক্তি কাজ করছে এবং প্রত্যেকেরই এতে কোনো না কোনো ভূমিকা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অভিবাসন এখন একটি বাস্তবতা—যা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। দেশের ২ থেকে ২.৫ কোটি মানুষ এমন জীবনযাপন করছে, যা জাতীয় অর্থনীতির প্রচলিত কাঠামোর বাইরে। এটি একটি মৌলিক পরিবর্তন কারণ এদের রোজগার ও জীবনযাত্রার উপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সীমিত। ফলে, রাষ্ট্রের প্রভাবও তুলনামূলকভাবে কম। এই প্রেক্ষাপটে কেউ কেউ যুক্তি দিতে পারেন যে, অভিবাসনের এই প্রক্রিয়া রাষ্ট্রকে কিছুটা দুর্বল করে তুলেছে। সেই অর্থে এটিও "দাম চুকানোর" মধ্যে পড়ে কিনা দেখা দরকার।

তবে রাষ্ট্র অভিবাসনের সঙ্গে দালিলিকভিত্তিতে জড়িত এবং লাভবান, বিশেষ করে প্রবাসীদের পাঠানো ডলারের মাধ্যমে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের ক্ষেত্রে সরকার দারিদ্র্য বিমোচনে ততটা সক্রিয় নয়, যদিও বাস্তবে এই অভিবাসনের ফলেই দারিদ্র্য অনেকাংশে কমছে। অর্থাৎ, দুবাই হোক বা ঢাকা—এই অভিবাসীরা নিজেরাই তাদের জীবন পরিস্থিতি বদলে দিচ্ছে, সমাজকে শক্তিশালী করছে। ফলে সনাতনী চিন্তাধারা তাই পাল্টাচ্ছে, এবং সমাজের ভূমিকা আগের চেয়ে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

এই পরিবর্তন অভিবাসনসহ আরো অনেক কারণে হচ্ছে তাই সেসকল প্রভাবকেই আমলে নেয়া দরকার। রূপান্তরকালে একাধিক সূচক মিলেই পরিবর্তন হয়, বাংলাদেশেও তাই হচ্ছে।

BRAC Institute of Governance and Development (BIGD) is a prominent Southern social science research and academic institute. BIGD is a part of Brac University—a leading Bangladeshi private university with a historically strong social commitment. We conduct rigorous, multi-method social science research, grounded in developing country operations, on a range of social and economic issues to promote practical, time-sensitive innovations for tackling governance and development challenges.

bigd.bracu.ac.bd

BIGDBRACUniversity

BIGD-BRACU

BIGD-BracUniversity

Design: Md. Abdur Razzaque